ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ২৩ জুমাদা-আল-আখিরাহ, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১২ ঈসাব্দ

এই সংখ্যাতে আছে

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (৬ ও ২০ এপ্রিল)
- প্রেস রিলিজ
  (যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে নতুন মসজিদ উদ্বোধন)
- ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি
  নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত
- যার অন্তরে কণা-পরিমাণ অহংকার আছে
  সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না
- ইলেকট্রনিক-মিডিয়া ব্যবহার সম্পর্কে
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর
  উপদেশ ও নির্দেশাবলী
- কেন আহমদী হলাম
- মসজিদ শান্তি ও কল্যাণের স্থান
- বাংলার কিংবদন্তি
  জার্মানীর প্রথম মিশনারী
  খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

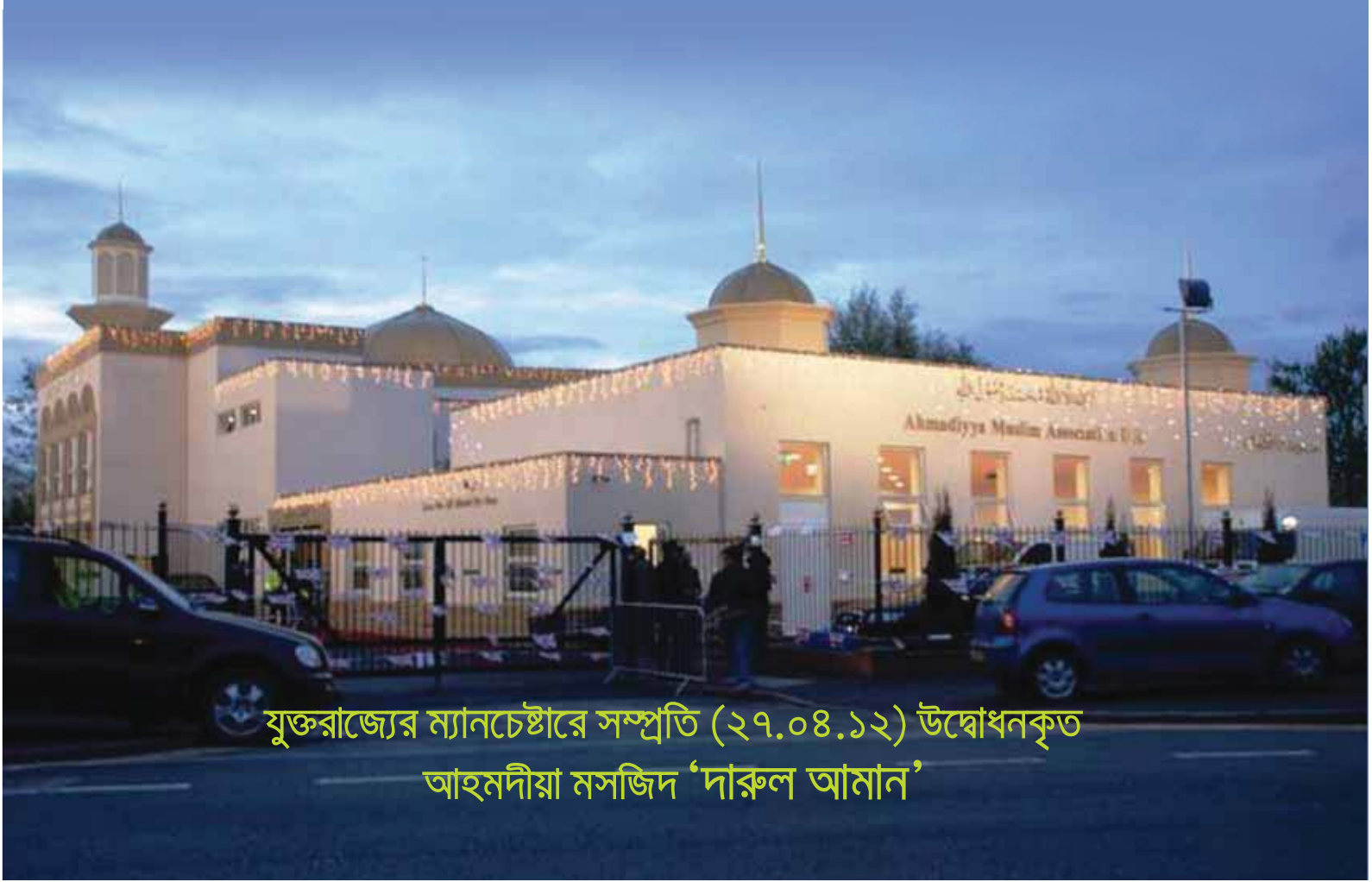

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে সম্প্রতি (২৭.০৪.১২) উদ্বোধনকৃত
আহমদীয়া মসজিদ ‘দারুল আমান’

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

Member | REHAB

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS

207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207 Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:

International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer), Awl Fashion, (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay, (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities

- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

এই জামাতকে এমন একটি জাতি বানানো হবে যাদের আদর্শ দেখে মানুষ খোদাকে স্মরণ করবে

যেসব লোক আমার সাথে খাঁটি সম্পর্ক রাখে তারা হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখতে থাকে এবং আমার সংস্পর্শের আশীষ লাভ করার জন্য খোদা তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকে। কিন্তু আফসোস! আমি দেখছি, কিছু লোকও এমন আছে যারা সাক্ষাতের পর বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে একটি পোষ্টকার্ডও লিখে না। এতে আমি এই কথাই বুঝি, তাদের হৃদয় মরে গেছে। তাদের অভ্যন্তরীণ চেহারায় কুষ্ঠের চিহ্ন আছে। আমি তো অনেক দোয়া করি যেন আমার জামাতের সকলে ঐসব লোকের মত হয়ে যায়–যারা খোদা তাআলাকে ভয় করে নামাযে কায়েম থাকে, রাত্রে ওঠে সেজদারত হয়ে ক্রন্দন করে ও খোদার ফরযসমূহকে বিনষ্ট করে না। তারা কৃপন, দানবিমুখ ও গাফেল নয়। তারা পৃথিবীর কীট নয়।

আমি আশা রাখি, খোদা আমার দোয়া কবুল করবেন এবং আমাকে দেখাবেন, আমি আমার পশ্চাতে এমন লোকই রেখে যাব। কিন্তু যাদের চোখ ব্যভিচার করে এবং যাদের হৃদয় মলাধার হতেও নিকৃষ্ট এবং যারা কখনও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি ও আমার খোদা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। **আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব যদি এই সকল লোক এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। কেননা খোদা এই জামাতকে এরূপ একটি জাতি বানাতে চান, যাদের আদর্শ দেখে মানুষ খোদাকে স্মরণ করবে এবং যারা তাক্‌ওয়া ও পবিত্রতার প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে।** কিন্তু ঐ সকল ফাসাদপরায়ণ লোক, যারা আমার হাতে হাত রেখে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে বলে বয়আত গ্রহণ করার পর নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়ে এরূপ ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের হৃদয়ে দুনিয়াদারী ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

তাদের দৃষ্টি পবিত্র নয়; তাদের হৃদয় পবিত্র নয়; তাদের হাত দিয়ে কোন পুণ্য কাজ সাধিত হয় না; তাদের পা কোন পুণ্য কাজের জন্য তৎপর হয় না। তারা ঐ মুষিকের ন্যায়-যা অন্ধকারেই বড় হতে থাকে এবং তাতেই অবস্থান করে এবং তাতেই মারা যায়। তারা আকাশে আমার জামাত হতে কর্তিত হয়েছে তারা বৃথাই একথা বলে, আমরা এই জামাতে প্রবেশ করেছি। কেননা, আকাশে তারা জামাতভূক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। যারা আমার এই নির্দেশ মানে না যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনে একটি পবিত্র বিপ্লব ঘটে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তারা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র সংকল্পের মানুষ হয়ে যাবে; নোংরামি এবং হারামখোরীদের সব পোশাক নিজেদের দেহ হতে ছুঁড়ে ফেলবে, মানব জাতির প্রতি সহানুভূশীল এবং খোদার প্রকৃত আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যাবে এবং নিজেদের সকল আত্মপ্রাধান্যকে বিদায় দিয়ে আমার পশ্চাতে অনুগমন করবে-আমি এরূপ ব্যক্তিদের ঐ কুকুরের সাথে তুলনা করি, যে এরূপ জায়গা হতে পৃথক হয় না, যেখানে মৃতদেহ ফেলা হয় এবং যেখানে বিকৃত ও গলিত লাশ থাকে। আমি কি ঐ সব লোকের মুখাপেক্ষী-যারা মৌখিখভাবে আমার সাথে রয়েছে এবং এভাব তারা লোক দেখানো একটি জামাত?

আমি সত্য-সত্যই বলছি, যদি সকল মানুষ আমাকে ছেড়ে যায় এবং একজনও আমার সাথে থাকে, তাহলে আমার খোদা আমার জন্য অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন–যারা সত্যিনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এদের চেয়ে উত্তম হবে। একটি ঐশী আকর্ষণ কাজ করছে, যার ফলে সৎ ও সরলপ্রাণ লোকেরা আমার দিকে দৌড়ে আসছে। এই ঐশী আকর্ষণকে বাধা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। কোন-কোন লোক খোদার চেয়ে নিজের চালাকি ও প্রতারণার উপর অধিক ভরসা করে। সম্ভবত তাদের হৃদয়ে এই কথাটি লুকিয়ে রয়েছে, 'নবুওয়াত ও রিসালত' এসব বিষয়ে মানুষের চালাকি, এবং দৈবক্রমে এগুলি প্রচারিত ও গৃহীত হয়ে থাকে। এই ধারণা অপেক্ষা ঘৃণ্য ধারনা আর নেই এরূপ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত, এরূপ স্বভাব অভিশপ্ত! খোদা তাদের লাঞ্ছিত করে মৃত্যু দিবেন। কেননা, তারা খোদার কার্যালয়ের শত্রু। এরূপ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক এবং এদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই কর্দমাক্ত। তারা নারকীয় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুর পর নরকের অগ্নি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না।

১৫ মে ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২০ এপ্রিল ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
প্রেসরিলিজ	১২
৬ এপ্রিল ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১৬
ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	২৩
ইলেকট্রনিক-মিডিয়া ব্যবহার সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর উপদেশ ও নির্দেশাবলী ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২৫
কেন আহমদী হলাম সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৬
মসজিদ শান্তি ও কল্যাণের স্থান মাহমুদ আহমদ সুমন	২৮
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৯
যার অন্তরে কণা-পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না মেহাম্মদ আমীর হোসেন	৩১
নবীনদের পাতা	৩২
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۳﴾

১৩। তিনি ভীতি ও আশা[১৪২৮] (সঞ্চার) করতে তোমাদেরকে বিদ্যুতের (চমক) দেখান এবং ঘন মেঘ (ওপরে) উঠান।

وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ ۚ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ وَ هُمْ یُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ﴿۱۴﴾

১৪। আর বজ্রধ্বনি তাঁর প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁর ভয়ে ফিরিশ্‌তারাও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে)। আর তিনি বজ্যপাত করেন এবং যাকে চান এর মাধ্যমে বিপদাপন্ন করেন। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক্‌বিতন্ডা করে থাকে, অথচ তিনি শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۵﴾

১৫। প্রকৃত দোয়া[১৪২৯] কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে। আর তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে তারা এদের ডাকে কোন সাড়াই দেয় না। (এরা) ঠিক সেই ব্যক্তির মত, যে পানির জন্য দু'হাত বাড়ায় যেন তা নিজে নিজে তার মুখে পৌঁছে যায় কিন্তু তা কখনো তার কাছে পৌঁছাবার নয়[১৪৩০]। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরতেই থাকে।

১৪২৮। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মানুষের মনে ভয় এবং আশা উভয়েরই সঞ্চার হয়। ভয়ের উদ্রেক হয়, কারণ বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, এমনকি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও নষ্ট হয়, কোন কোন গাছ-পালা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়। এই বিদ্যুৎ আবার মানুষের জন্য আশাও নিয়ে আসে। কারণ তা উর্বরতা দানকারী বৃষ্টির আগমন ঘোষণা করে এবং নানা প্রকার রোগের জীবাণু ধ্বংসের সহায়ক হয় এবং মহামারি বিস্তার রোধ করার কাজ করে থাকে।

১৪২৯। 'দাওয়াতুল হক' অর্থাৎ প্রকৃত দোয়া কেবল তাঁরই অধিকার। এর অর্থ এভাবেও করা যায় : (১) আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, (২) শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতই মানুষের জন্য উপকার ও কার্যকর, (৩) একমাত্র আল্লাহ্‌রই আওয়াজ সত্যের সমর্থনে অগ্রসর হতে থাকে এবং (৪) কেবল তাঁর কথাই চিরস্থায়ী।

১৪৩০। জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সঠিক পথ হলো প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা, যথা স্রষ্টাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া এবং সৃষ্টির সব কিছুর স্ব স্ব উপযুক্ত স্থান স্বীকার করে নেয়া। এই হলো সফলতা ও শান্তির চাবিকাঠি।

হাদীস শরীফ

নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন এরপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তি মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার, আল্লাহ্ তাআলা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার উপর সঠিকভাবে আমল করবে তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"কিছু লোক ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আ'মেলুস সা'লেহাতে লাইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম" এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - (তোমাদের মধ্য হতে)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধপতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।

এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খিলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?

যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত মানে সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তাআলার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪ ও ৫৮)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের খিলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশিস হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খলীফা আল্লাহ্ তাআলা নির্বাচিত করেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খলীফা আল্লাহ্ তাআলা নির্বাচিত করেন

"সূফীগণ লিখেছেন– যে ব্যক্তি কোন শেখ বা নবী রসূলের পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত হন, সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর ওপর হক্ব নিহিত করে দেন। কোন রসূল বা মাশায়েখ যখন মৃত্যু বরণ করেন পৃথিবীতে তখন এক ভূমিকম্পের অবস্থা বিরাজ করে। আর এটা ভয়ানক এক সময় হয়ে থাকে। কিন্তু খোদা তাআলা কোন খলীফার মাধ্যমে তা দূর করেন। খলীফার মাধ্যমে পরে এই বিষয়টি সংশোধন করে নতুনভাবে এতে দৃঢ়তা দান করেন।

আঁ হযরত (সা.) নিজের পর খলীফা নির্ধারণ করে যান নি কেন? এর মাঝে এ রহস্যই ছিল। তাঁর (সা.) ভালই জানা ছিল আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এক খলীফা নির্বাচন করবেন। কেননা এটা খোদারই কাজ। আর খোদার নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে এই কাজের জন্য খলীফা বানিয়েছেন। আর সর্ব প্রথম তাঁর মাঝেই হক্ব নিহিত করেছিলেন।" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ-৫২৪)

নেযামে খিলাফত চিরস্থায়ী

খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজের মাঝে রাখেন। এ জন্য রসূল (সা.) চাননি অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক। কেননা বাস্তবিক অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না সেহেতু খোদা তাআলা সংকল্প করে নিয়েছেন–রসূলের সত্ত্বা যা জগতের অপরাপর সকল সত্ত্বা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম সেটাকে যেন প্রতিচ্ছায়া আকারে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তাআলা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগত কখনও কোন যুগে নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে যায়। আর জানে না এটা কখনও খোদা তাআলার ইচ্ছা ছিল না–রসূল করীম (সা.) এর মৃত্যুর পর মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত নবুওয়তের বরকতকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

এরপর এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাক এতে কিছু যায় আসে না!.....সুতরাং খোদা তাআলার ব্যাপারে এমনটা মনে করা একটা হীন চিন্তাধারা–তাঁর শুধুমাত্র .....ত্রিশ বছরের চিন্তা ছিল। পরে সর্বদার জন্য পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর ঐ নূর যা প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে খিলাফতের আয়নায় পরিদৃষ্ট হতো, এদের জন্য তা দেখানোর অনুমতি নেই! সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল খোদার জন্য এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে? কখনও না। আর এ আয়াত ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী।.....কেননা এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে .....খিলাফত চিরস্থায়ী। এজন্য 'ইয়ারিমুহা' শব্দ স্থায়ীত্বকে চায়।

কারণ হলো, যদি শেষ সুযোগ দুষ্কৃতকারীরা পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তারাই হয়ে যাবে – সৎকর্মশীলরা হবে না। সবার উত্তরাধিকারী তারাই হয় যারা সবার পরে আসে।

(শাহাদাতুল কুরআন,
রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৫৩-৫৪)

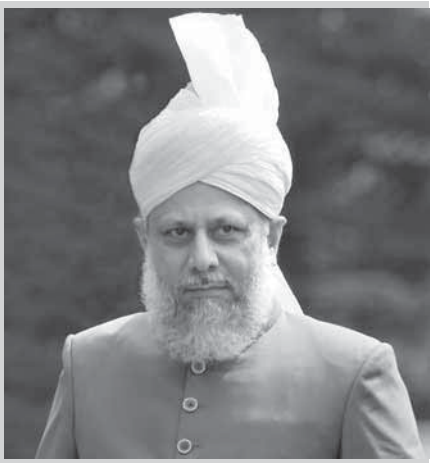

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ এপ্রিল ২০১২-এর (২০ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

আজকেও আমি সম্মানিত সাহাবাদের কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। প্রথমে এমন ঘটনাবলী থাকবে, যাতে তাঁদের দৃঢ়চিত্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই বয়আত করেছিলেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় নি, তিনি বলেন, যে-বছর জাফর ওয়াল তহসিলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, সে-বছর ক্লার্ক হিসেবে শিয়ালকোট থেকে জাফর ওয়ালে আমার বদলী হয়। সকাল বেলা তালওয়াণ্ডি এনায়েত খাঁন নিবাসী চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব আমাকে বললেন, তুমি কি হযরত ঈসা (আ.) জীবিত অবস্থায় আকাশে আছেন বলে বিশ্বাস কর? আমি বিজ্ঞানের আলোকে বললাম, না। আমার হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তিনি বললেন, কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দাবী করেছেন, যে মসীহ্‌র আগমনের কথা ছিল, তিনিই সেই মসীহ্ এবং বণী ইসরাঈলী মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে বয়আতের চিঠি লিখে পাঠালাম। তারপর চাকরীর কারণে প্রথমে করাচী, তারপর আফ্রিকা চলে যাই।

আমার পিতা অ-আহমদী ছিলেন। আমার বয়আতের সময় তিনি মোটেই বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি নিজ-এলাকায় একজন নেতৃস্থানীয় ওহাবী ছিলেন। অন্যেরা তাকে উত্তেজিত করে যে, তোমার ছেলে মির্যায়ী (কাদিয়ানী) হয়ে গেছে। ১৯১১ সালে আমার পিতা আমাকে লিখলেন, আমি যা বলছি তা হযরত সাহেবকে লিখে দাও। যদি না লিখ তাহলে আমি তোমাকে আমার সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব। সে সময় আমি কেনিয়ার 'সুলতান হামুদ' স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ছিলাম। আমি আট দশদিন ঐ চিঠি কাছে রাখলাম। এক রাতে এশার নামাযের পর আমি আমার স্ত্রীকে চিঠির কথা বললাম। আমার স্ত্রী একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। আমার স্ত্রী বললেন, 'এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মাহদী মানতে প্রস্তুত নয় কিন্তু আমাদেরকে কেন বলে যে, তাঁকে মন্দ কথা বল? আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ উপার্জনের ব্যবস্থা) অতএব এদিক থেকেও চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি তাঁকে লিখে দিন, আমরা এর জন্য মোটেও সঙ্কিত নই। আপনি যদি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চান, করতে পারেন।' আমিও সে ভাবেই লিখে পাঠালাম। আমার পিতা আমাকে লিখলেন, 'তুমি আমার একমাত্র পুত্র সন্তান, তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। আমি অন্যের উস্কানীতে অমনটি লিখেছিলাম।' আমি আবারো আমার পিতাকে একই কথা লিখলাম। কিন্তু বাবার পক্ষ থেকেও একই উত্তর পেলাম।

আমি ছুটিতে দেশে আসলাম। একদিন সকাল প্রায় ৯টার সময় আমি, ভাই মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং ভাই মোহাম্মদ আলম সাহেব আব্বার সাথে মতবিনিময় করছিলাম। খুব উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল। আমার আব্বা বললেন, 'আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে ঐ সময় থেকে চিনি-জানি, যখন তিনি শিয়ালকোটে চাকরীরত ছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম। তিনি খুবই পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। আমার মনে আছে, একবার আমার উপস্থিতিতে শিয়ালকোটের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন এক গ্রাম্য-ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের কাছে এসে বলল, [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাধারণত মির্যা জ্বী বা মির্যা সাহেব বলা হত] 'আমি মনে করি, আপনিই সে-ই মাহদী যার আগমনের ভবিষ্যবাণী রয়েছে।' তখন হযরত মির্যা সাহেবের বয়স ২০ অথবা ২২ বছর ছিল। আর আমার বয়সও প্রায় তেমনই ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন এ কথা বললেন, তখন আমি বললাম, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে সেই জমিদার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এমন কথা বলেছে! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনার জন্য এ বিষয়টি তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু আমার পিতা বললেন, মির্যা সাহেব সত্য হলেও আমি তাঁকে মানব না।' এ কথা শুনে আমরা ইস্তেগফার পড়তে পড়তে সে-স্থান থেকে উঠে চলে গেলাম।

হযরত শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব বর্ণিত আরেকটি ঘটনা রয়েছে তিনি বর্ণনা করেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী বোপাড়ী বাটালা এসেছিল আর আমাদের বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং আমার পিতা-মাতা আমাকে বাড়ি থেকে পূর্বেই বের করে দিয়েছিলেন। একদিন আমার বাবার বন্ধু মেহের রালদুর সাথে আমার সাক্ষাত হয়।

তিনি আমাকে বলেন, আমার সাথে চলো– মৌলভী মুহাম্মদ আলীর সাথে কথা বলে আমরাও জেনে নেই, তিনি কি বলতে চান? অর্থাৎ অ-আহমদী মৌলভী মুহাম্মদ আলী ও তাঁর মাঝে বাহাস করাবেন এবং দেখবেন, সে কি বলে। সে দিনগুলোতে আমার উদ্যম ও উচ্ছাস ছিল প্রবল। তখনই আমি তার সাথে মৌলভী মুহাম্মদ আলীর কাছে গেলাম। তার সাথে সাক্ষাতের পর মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, মেহের রালদু! এই কাফিরকে আমার সামনে কেন এনেছো? এ কথাটি মেহের রালদু সাহেব ও আমার কাছে অসহ্য মনে হলো। কিন্তু আমি বিষয়টি তার সামনে স্পষ্ট করতে চাইলাম। মেহের রালদু সাহেবও আমার কথা সমর্থন করে বললেন, এই ছোট্ট ছেলেকেই যদি বুঝাতে না পারেন, তবে অন্য মির্যায়ীদের কীভাবে বুঝাবেন? এ ছেলেই যদি আপনার কাছে বুঝতে না পারে, তবে আর কে বুঝবে? এ কথা বলায় সে كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ -এর হাদীসটি পড়া শুরু করল এবং নিজেই ওয়াজের সুরে এর ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করল। সে যখন অনেক সময় নিয়ে নিল, আমি বললাম, আমারও কিছু কথা শুনুন। কেননা এ হাদীসের শব্দগুলো প্রমাণ করে, এটি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস।

এ বিষয়ে তার সাথে আমি জেরা আরম্ভ করলাম। আমার প্রশ্নে সে বিরক্ত হয়ে গেল। এ হাদীসটি বুখারীর, কিন্তু মুসলিম ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এর শব্দগুলো হল, كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইবনে মরিয়ম অর্থাৎ মাসীলে মসীহ্ বা মসীহ্‌র প্রতিচ্ছবি আবির্ভূত হবেন, যিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই ইমাম হবেন। যেভাবে আমি বলেছি, অন্য আরেকটি বর্ণনায় এটিও আছে, তোমাদের মধ্যে থেকে হবার সুবাদে তিনি তোমাদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই মৌলভী এ হাদীসটিই উল্লেখ করেছিল, কিন্তু আমি তাকে বলেছি, তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছ। পরে আমি مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ অর্থাৎ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম একজন রসূল মাত্র। এবং এরপর وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছু নন। আয়াতদ্বয় উপস্থাপন করি, তারপর 'কামা ক্বালা আব্দুস সালেহ্' অর্থাৎ তখন আমিও পুণ্যবান বান্দার ন্যায় বলবো– হাদীসটি পড়ি। এটিও একটি দীর্ঘ হাদীস; এর ব্যাখ্যা যখন একটু বিস্তারিত বর্ণনা করলাম, তখন সে খুব অস্থির হয়ে গেল এবং রাগে ও ক্ষোভে গজগজ করে মেহের রালদু সাহেবকে সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাকে বলি নি, সে সোজা হবে না? মির্যায়ীরা খুব কট্টর ও বেয়াদব হয়ে থাকে। আমি আর কোন কথা বলবো না। ফলে মেহের রালদু সাহেবও খুব লজ্জিত হলেন, তার চেহারায়ও লজ্জার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল, কেননা মৌলভী কোন যৌক্তিক উত্তর দিতে পারছিল না এবং আমাকে বুঝাতেও পারছিল না।

যাহোক, আমরা উঠে চলে আসলাম। মেহের রালদু সাহেব আমার পিতাকে বললেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী আব্দুর রশীদকে ভালভাবে বুঝাতে পারে নি বরং সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। অল্প বয়স্ক, কিন্তু পরে বুঝে যাবে। আজও অবস্থা একই। তাদের, অর্থাৎ অ-আহমদীদের মৌলভীরা যতটা জ্ঞান রাখে, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের শিশুকিশোররাও অনুরূপ জ্ঞান রাখে। বরং আমাদের (বাচ্চাদের) জ্ঞান তাদের মৌলভীদের চেয়ে বেশি। তারা বাচ্চাদের সাথেও পারে না। কিন্তু নির্লজ্জতার তো কোন ঔষধ নেই। আমার মনে পড়ে, জনাব সাকেব জিরভী সাহেব লিখেছিলেন, কয়েক দশক পূর্বে আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী নামে একজন মৌলভী ছিলেন, তিনি এক জায়গায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছেও খবর আসলো। কেননা ঘটনাক্রমে আমি তখন উক্ত এলাকায় অবস্থান করছিলাম। ইনি অর্থাৎ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী বড় নামকরা আলেম ছিলেন। আর মৌলভী সাহেব বলছিলেন, **'যদি খোদা তা'লাও আমাকে এসে বলেন যে, মির্যা সাহেব সত্যবাদী, তবুও আমি তাকে মানব না'।** অতএব এই হল তাদের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ।

আরো একটি ঘটনা হলো, আলী মোহাম্মদ সাহেব হযরত মওলানা আবুল হাসান সাহেবের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি অতি উচ্চ মানের আলেম ছিলেন। হযরত আকদাস (মসীহ মওউদ আ.)-এর নাম এবং বাণী পুরো ডেরাগাযী খাঁন জেলায় তাঁর মাধ্যমেই পৌঁছেছে। বিরোধীরা তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তিনি খুবই অবিচল ছিলেন। কখনো তিনি কোন বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। সর্বদা তবলীগে নিয়োজিত থাকতেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন। হযরত হাফিয গোলাম রসূল সাহেব উজিরাবাদী বলেন, একবার আমি বিরোধিতার কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে কাদিয়ান চলে আসি। তখন হুযূর (আ.) বলেন, হাফিয সাহেব! আপনি কেন ভীতিগ্রস্থ? সে সময় হুযূরের বাচনভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, হুযূর আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চান। কিন্তু আমি তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি, অর্থাৎ আমি তখন সে উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হই নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আত্মার প্রশান্তি লাভ এবং বিরোধীদের বিরোধিতায় হৃদয়কে সন্ত্রস্ত হওয়ার উর্ধ্বে রাখার শক্তি লাভ করা। কেননা নবীর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে মানুষ এক প্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। মোটকথা তিনি বলেন, আমি আমার হৃদয়কে দৃঢ় করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রত্যাদিষ্টদের কাছে অর্থ- লাভের উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত নয়, বরং যথাসাধ্য তাদের সমীপে কিছু না কিছু উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করা উচিত। হুযূর আমার জন্য অনেক দোয়া করেন এবং অতি সান্ত্বনামূলক উপদেশ বাণীর মাধ্যমে আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার হৃদয়ে হুযূরের সত্যতার ব্যাপারে এক মিনিটের তরেও কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় নি।

হযরত বাবু আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন-আমার বিনয় ও দ্বীনতার কারণে আমার সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং মহল্লার লোকজন ও শহরবাসীরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল এবং আমার প্রশংসা করত। কিন্তু আমার বয়আতের সংবাদ শুনে হঠাৎ করে পিতৃকূলের আত্মীয়স্বজন, যাদের সবাই খোদা তা'লার কৃপায় আমার সাথে বয়আত করেছিল, তারা ছাড়া বাকী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহল্লাবাসী সবাই ক্ষেপে যায় এবং আমার শত্রু হয়ে যায়। আর নবীদের জামাতের সাথে এরূপ আচরণই হয়ে থাকে। নবীদের সাথে এমন আচরণ করা হলে তাঁদের অনুসারীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ হতেই পারে। সবাই তাদেরও শত্রু হয়ে যায়। যারা প্রশংসা করত, তারাই শত্রু হয়ে যায়। অথচ তারা এ কথাও বলে যে, সে পুণ্যবান, বড়ই পুণ্যবান। আমি পূর্বেও দু'একবার হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব সম্পর্কে শুনিয়েছিলাম। একবার আমি ফয়সালাবাদের একটি গ্রামে যাই। সেখানে অ-আহমদীরা বসে ছিলো। তারা তাঁর খুব প্রশংসা করছিল- এমন নেক, পুণ্যবান এবং খোদাভীরু মানুষ, সঠিক ও সত্য কেস গ্রহণকারী ও সত্যবাদী

উকিল আমরা আর দেখিনি। কিন্তু তার একটা দোষ, আর তা হল, সে কাদিয়ানী। অতএব তাদের দৃষ্টিতে এটিই সবচেয়ে বড় অন্যায় ।

যাহোক, ইনি বলেন, সবাই আমার শত্রু হয় এবং আমাকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেয়া ও নির্যাতন আরম্ভ করে। কখনো শালিস বসতো, কখনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন হুক্কা-পানি, ইত্যাদি বন্ধ করে দিত, কখনো মৌলভীদেরকে ডেকে আমাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ মাহফিল করাতো এবং আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব আর জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। একজন দুধ বিক্রেতা আমাদের সাথে ছিল। তার থেকে দুধ নেয়া বন্ধ করে দিল। শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করে দিল, আর আত্মীয়তা-করা বন্ধ করে দিল এবং লোকদেরকে বলত, যদি কেউ কাদিয়ানীদের বাড়ীর নিচ দিয়ে যায় তবে সে-ও কাফির হয়ে যাবে। খোদা তা'লার লীলা দেখুন! আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে প্রতিশোধ নেন। তিনি বলেন, যে মৌলভী মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, সে-ই আমার ঘরে এসে খাবার খেতো। অর্থাৎ, নসীহত করতো এক রকম আর কাজ করতো তার বিপরীত। মানুষ মৌলভীর এমন কর্ম দেখে খুবই লজ্জিত হল। এরপর বলেন, বয়আত করার পর আমরা নামায জামাতের সাথে পড়তাম, যেহেতু অ-আহমদী ইমামদের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, হয় একা নামায পড়তাম অথবা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে নিতাম। এ কারণে মহল্লাবাসী ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিল। আমরা ঝগড়া-বিবাদ এড়ানোর জন্য মসজিদে নিজেদের পৃথক ইমামের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলাম, বরং নিজেদের বাড়িতে বাজামাত নামায পড়তাম। তিনি বলেন, যে ঘরটি আমি ভাড়ায় নিয়েছিলাম, সে ঘরটিও নামায পড়ার অপরাধে বাড়ির মালিক খালি করিয়ে নিল। এরপর অন্য একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে বাজামাত নামায পড়া শুরু করে দিলাম। তিনি বলেন, আমরা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে রমযান নামে একজন আহমদীর নিকট থেকে কিছু জমি সহ তিনটি দোকান ক্রয় করে নিলাম। আর তখন একজন আহমদী ডাক্তার বাশারাত সাহেব সেখানে বিভাগীয় সহকারী সার্জেন্ট হিসাবে বদলি হয়ে আসেন। ডাক্তার সাহেবের আগমনের ফলে জামাত শক্তি লাভ করল। তিনি উদ্দীপ্ত একজন মানুষ ছিলেন। মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায বাজামাত দোকানে পড়তেন। ডাক্তার সাহেবকে আমাদের ইমাম বানিয়ে নিতাম। দোকান সড়কের পাশেই অবস্থিত ছিল। কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই তিনি দোকানে আসতেন এবং বাজামাত নামায পড়াতেন। ডাক্তার সাহেব সর্বদা তবলীগে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি আবেগের সাথে বলতেন, আমার মন চায়, একটি কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে "ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন" লিখে নিজের বুকে কোটের উপর ঝুলিয়ে ঘোষণা দিতে থাকি যে, ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

হযরত শেখ আতাউল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমি আমার বয়আতের মঞ্জুরী কাদিয়ান থেকে পত্র মারফত লাভ করি এবং সাথে জামাতের কিছু পুস্তকাদি ও আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়, যার মাঝে আল্ হাকাম পত্রিকাও ছিল । আমরা তা প্রচার করেছি। লোকদের মাঝে চর্চা হয় এবং চর্চার পর বিরোধিতার বাজার খুবই গরম হয়ে উঠে। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ হতে থাকে। উক্ত জলসাগুলোতে আমাদেরকে ধরে ধরে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত এবং তওবা করতে বাধ্য করা হত। (বলা হত) বলো, মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী, আমরা এখন আর তার মুরিদ নই। তিনি বলেন, দুর্বল-চিত্তের যারা ছিল, তারা স্খলিত হতে থাকল, কঠোরতা সহ্য করা তাদের জন্য দুরূহ ছিল। তাদের মাঝে অবিচলতা ছিল না, আর ধীরে ধীরে অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে, হযরত হাফিয সূফী তাসাউর হুসাইন সাহেব এবং শেখ সাদুল্লাহ্ সাহেব, যিনি সূফী সাহেবের মুরিদ ছিলেন, আর এ অধম অবশিষ্ট ছিল, আর অন্য সবাই শত্রুর অত্যাচারের ভয়ে ফিরে গেল। তখন তিনজন ব্যতিরেকে অন্য সবাই আহমদীয়াত পরিত্যাগ করল, কঠোরতা সহ্য করতে পারলো না। কিন্তু তারা (তিনজন) নির্যাতন সহ্য করেছেন, দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেন, সূফী সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন। তিনি কাদিয়ানে পৌঁছে নবুয়তের জ্যোতি থেকে অংশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ আর সবিশেষ প্রজ্ঞা আমার হৃদয়কে অদৃশ্য থেকে আলোকিত করেছে। সূফী সাহেব কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখে এসেছিলেন, তাঁর ইমান দৃঢ় ছিল, কিন্তু আমি তখনো (কাদিয়ান) যাই নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন এবং আমার হৃদয়কে আলোকিত রেখেছেন। নিজ-শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোকিত করেছেন। আমার উপর বিরোধিতার কোনরূপ প্রভাব পড়ে নি। না আমি তাদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করেছি, বরং তারা যত চাপ দিত ও ভয় দেখাত, আমার ঈমান আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়ায় আরো সুদৃঢ় হত। তাদের তওবা করানোর দাবী এই বলে প্রত্যাখ্যান করতাম, আপনারা কোন বিষয়ে তওবা করাবেন?

আর একটি ঘটনা হল, হযরত মিয়াঁ আব্দুল মুজীব খাঁন সাহেবের। তিনি বলেন, একবারের ঘটনা– বিরুদ্ধবাদীরা একটি বড়-সমাবেশ করে বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আর তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম আমি, অর্থাৎ হযরত মিয়াঁ আব্দুল মুজীব খাঁন সাহেব। তাঁকে সব ধরনের বিরোধিতার লক্ষবস্তু বানিয়েছে। তারা আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবাদি এনেছে। বয়কটের ভয় দেখানো হয়েছে, পুলিশকেও আমার বিরুদ্ধে উস্কানো হয়েছে। আর আমাকে নৈরাজ্য-সৃষ্টিকারী এবং বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে আমার বিরুদ্ধে এমনভাবে প্ররোচিত করা হয়েছে যে, তারা আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কেমন তা ছিল তিনি বর্ণনা করছেন। এক রাতে আমি জঙ্গলে বের হলাম, কিব্‌লা মুখী হয়ে হাত বেঁধে দাঁড়ালাম এবং নিজের মত করে সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানসপটে সম্বোধন করে নিবেদন করলাম, হুযূর! এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে সাহায্য ও পথপ্রদর্শনের কোন বিধান বাতলে দিন। আর আমি প্রার্থনা ও দোয়া এমন আকুতি-মিনতী ও বিগলিত চিত্তে করি এবং কেঁদে কেঁদে আপন অবস্থা ও আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার আহাজারী শুনলেন। এখানে আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি, এটি শির্কের কোন ব্যাপার ছিল না, যেমনটি পীর-ফকীরের সামনে গিয়ে চাওয়া হয়, সেজদা করা হয় অথবা তাদের দোহাই দেয়া হয়। যাহোক এটি তাঁর নিজস্ব-রীতি ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও কল্পনায় এনেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এটি স্পষ্ট করছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে চাওয়া হচ্ছিল না, আল্লাহ্ তা'লার কাছেই চাওয়া হচ্ছিল। আর তার 'আল্লাহ্ আমার আহাজারী শুনেছেন' বাক্যটি এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। তিনি এটি বলেন নি, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে রেখেছি আর তিনি শুনেছেন'। যেমনটি সাধারণত পীর-ফকীরদের কবরে গিয়ে করা হয়। এরপর তারা বলে, 'আমার উমুক পীর সাহেব কথা শুনেছেন এবং আমাকে উমুক জিনিস দান

করেছেন'। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার আহাজারী এবং কান্না শুনেছেন। যাহোক, এমন চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখি, বিরুদ্ধবাদীরা আমার ঘর চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসছে, এ ব্যক্তিকে এখন প্রাণে মেরে ফেল। ঠিক তখনই সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার সামনে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁর পবিত্র হাতে আমার বাহু ধরে আমার মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, আকাশের দিকে উড়ে চলে যাও। অতঃপর হুযূরের পবিত্র করণ শক্তির মাধ্যমে আমার মত ডানাহীন মানুষ আকাশের দিকে চলে গেলাম। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো। তখন আনন্দে আমারঘুম ভেঙ্গে গেল এবং দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মালো, সত্য-সত্যই সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস খোদা তা'লার একজন পবিত্র ও সত্যবাদী রসূল। পরবর্তী সকালে যখন বিরুদ্ধবাদীরা আবার আমার চতুর্পার্শ্বে সমবেত হল তখন আমি তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আল্লাহ্ তা'লা তার ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাকে সেই শক্তি দান করেছেন, তোমরা যদি করাত দিয়ে আমার শরীর দ্বিখন্ডিত করে ফেল, তবুও আমার এই হৃদয় ও মুখ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না । তিনি বলেন, পরদিন (দ্বিতীয়) রাতে আবার স্বপ্নে দেখি, পুলিশ আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। এই শত্রুতার অবসান হচ্ছিল না, প্রতিদিনই কোন না কোন সমাবেশ তাঁর বিরুদ্ধে হচ্ছিল। আর পুলিশ বলছে, জনগণের হাত থেকে এই ব্যক্তি রেহাই পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে যেহেতু একধরনের নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে এখন প্রশাসন এটিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দমন করবে। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। পুলিশের এ আক্রমণ ও ঘেরাও এর কারণে বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু হঠাৎ গতরাতের ন্যায় আমার নেতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার সামনে প্রকাশিত হলেন আর আগের মতই অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার হাত দু'টো ধরেন, তারপর আমার মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে বলেন, আকাশ পানে উড়ে চলে যাও। কাজেই আমি গতকালের ন্যায় মাটি থেকে আকাশের পানে উড়তে লাগলাম এবং পুলিশের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলাম।

অতএব উভয় স্বপ্ন আমার ঈমানকে লৌহকিলকের মত দৃঢ় এবং পাথরের ন্যায় মজবুত করে দেয়া। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা এভাবে আমার অন্তরে প্রোথিত হয়ে গেল যে, তা কাটলেও কাটবে না আর ভাঙ্গতে চাইলেও ভাঙ্গবে না। এই বিশ্বাসকে কেউ চাইলে না কাটতে পারবে আর ভাঙ্গতে পারবে। আলহামদুলিল্লাহ্, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি বলেন, এর ফলে আমার মনে এমন এক উদ্দীপনা ও আকাঙ্খার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত এ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করি। অতএব আমি হুযূর (আ.)-এর সমীপে পত্র লিখলাম, প্রতি উত্তরে হুযূর (আ.) লিখেন, আব্দুল হাদী তুমি দ্রুত কাদিয়ান চলে আসো, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ঈমানকে সুদৃঢ় করেন। এরূপ ঘটনা আজও অনেকে লিখে থাকেন। তাদের ভেতরও আল্লাহ্ তা'লা অনুরূপ (ঈমান ও উদ্দীপনা) সৃষ্টি করে দেন।

হযরত আমীর খাঁন সাহেব নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি বয়আত করে যখন কাদিয়ান হতে নিজ গ্রাম "আহ্‌রানা"য় ফেরত আসি, তখন মেহরাব খাঁন নামক এক ব্যক্তি আমার তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং গালমন্দ করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে (গ্রামের) নেতা গোছের লোক ছিল, আর মনে করত, আমি কিছু একটা হয়ে গেছি। কিছুটা লেখাপড়া জানার কারণে চরম অহংকারী ছিল এবং সবজান্তা হবার দাবী করত, প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতো। আমি (তার এ ব্যবহারে) ধৈর্য ধারণ করলাম। এক সময় তার পরিবার প্লেগে আক্রান্ত হয়, আর এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে যে, কয়েক দিনের ভেতর তার পুত্রবধু, ভাবী এবং একমাত্র ছেলে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ঘরে রান্নাবান্না করার মতোও কেউ বাকী রইল না। তার এক মেয়ে, যার নিকটবর্তী এক গ্রামে বিয়ে হয়েছিল, তার ঘরে গিয়ে খাবার খেতো। কিন্তু মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খাবার খাওয়া তার কাছে মৃত্যু তুল্য ছিলো। উল্লেখিত মাহতাব খাঁনের বয়স তখন ৬০ বছরের বেশি ছিলো। তার স্থাবর সম্পত্তি একরের চেয়ে ও কম ছিল। একদিন ফজরের নামাযের পর আমি মসজিদে বসে কুরআন পড়ছিলাম। সে আমার কাছে এসে বলল, তুমি দেখছো, আমার কি অবস্থা? কাবার দিকে হাত তুলে বলতে লাগলো, **'মির্যা সাহেবের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই'**। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হবার পর এটি তার মনে পড়লো।

সাহাবাদের ঈমানী-দৃঢ়তার কয়েকটি ঘটনা বললাম, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে জামাত দান করেছেন সে জামাত আজও দৃঢ়তা ও ধৈর্য ধারণের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখায়। আমার কাছে চিঠি-পত্র আসে এবং অনেকের সাথে সাক্ষাত হয়, সে-সময় তারা তাদের ঘটনাবলী শোনায়। এমন দৃষ্টান্ত যেখানে পুরুষরা স্থাপন করছেন, সেক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সাহাবাদের মধ্যে যে পবিত্র চিন্তাচেতনা সৃষ্টি হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা এখনো তা বজায় রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সেসব সাহাবার পদমর্যাদা আরো উন্নীত করুন, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছিলেন এবং ধৈর্যের উপর অবিচল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বংশধরদেরও সেই দৃঢ়তা দান করুন। তাদেরও ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও অবিচল রাখুন, যারা আজকের যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করছেন এবং আমাদের মাঝে রয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যতে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ধৈর্য ও অবিচলতা ছাড়াও অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সাহাবাদের সুরক্ষা এবং তাঁদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এ-রকম আরো কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরছি, যা নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি কারণ হবে।

হযরত মির্যা বরকত আলী সাহেব বর্ণনা করেছেন, এ অধম ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে কাংড়া জেলার ভাগসুতে'র ধরমশালা নামক স্থানে একটি ঘরের নীচে চাপা পড়েন এবং বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাবু গোলাব দ্বীন সাহেব ওভারশিয়ার পেনশার, যিনি তখন সেখানে সাব-ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এখনো শিয়ালকোটে জীবিত আছেন। এ ঘটনার দু' এক মাস পূর্বে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক মহা-ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (অর্থাৎ ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে এ ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন) তখন আমি স্বয়ং কাদিয়ান দারুল-আমানে উপস্থিত ছিলাম। আমি হুযূর কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ধর্মশালার ছাউনীতে পৌঁছাই। সে-বিজ্ঞপ্তিটি আমি বেশ ক'জন লোকের মাঝে বন্টনও করেছিলাম। যেহেতু আমি সেখানে কেরানীর কাজ করতাম এবং চাকরী অস্থায়ী হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট অবকাশ পেতাম, তাই আমি প্রায়ই সেখানে সাহাবী মির্যা রহীম বেগ সাহেব আহমদীর সাথেও সাক্ষাত করতে যেতাম। উক্ত মির্যা সাহেব মোঘলদের একটি সম্ভ্রান্ত

পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার অন্য ভাই আহমদী ছিল না। শুধু তাঁর স্ত্রী-সন্তান তাঁর সাথে আহমদী হয়েছিলেন, বাকী সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁর তীব্র বিরোধিতা করতো। যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তারা রক্ষা পান। অন্য কতক আহমদীও, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে পৌঁছেছিলেন বা সেখানে থাকতেন, তারা সবাই এ ভূমিকম্পের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এমনকি আমার ধারণা অনুযায়ী এ ভূমিকম্পে সেখানকার নব্বই শতাংশ লোক মারা যায়। এরূপ ভয়াবহ ভূমিকম্পে আমাদের সব আহমদীদের বেঁচে যাওয়া এক মহা নিদর্শন ছিল বৈ-কি। এর পূর্ণ বিবরণ যদি লিপিবদ্ধ করি, তবে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী আহমদীদের স্বপক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য দেখতে পাবেন। অর্থাৎ যে সত্য জানতে চায়, এ ভূমিকম্পের বর্ণনা শুনে অবশ্যই সে অনুধাবন করবে যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আহমদীদের সাথে রয়েছে। তিনি বলেন, আমার পরিবারবর্গ, গোলাব খাঁন সাহেবের পরিবারবর্গ এবং মিস্ত্রী আল্লাহ্ বখ্‌শ সাহেব শিয়ালকোটী এবং তাঁর সাথে গোলাম মোহাম্মদ মিস্ত্রী এবং অন্যান্য আহমদী বন্ধুদের এ ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পাবার ক্ষেত্রে যে প্রাকৃতিক উপকরণাদী প্রকাশিত হয়, তাতে প্রত্যেকের বেলায় পৃথক পৃথক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষভাবে, মিস্ত্রী ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের সেখান থেকে একদিন পূর্বে হঠাৎ করে অন্যত্র যাত্রা করা এবং কিছুদিন পূর্বে সেখান থেকে আবার দেশে ফেরা এবং ভূমিকম্পের পূর্বে কতিপয় বন্ধুর দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা এবং ভূমিকম্পে চাপা পড়ে বিস্ময়করভাবে উদ্ধার পাওয়া, এসব কিছুই নিদর্শন স্বরূপ ছিল। আর আমার ইচ্ছা, এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখে আপনার কাছে প্রেরণ করব। কিন্তু আপাততঃ সংক্ষিপ্তাকারে সেসব স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। জানিনা, তিনি পরে লিখেছেন কিনা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের প্রেক্ষিতে যে-বিষয়টি সামনে আসে, তাহলো, ভূমিকম্পের কিছুদিন পর খাকসার কাদিয়ানে যখন হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে আসে, হুযূর তখন বেহেশতী মাকবেরার সাথে অবস্থিত বাগানে আম গাছের ছায়ায় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁবুর ভেতর থাকতেন। যখন খাকসার হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন হুযূর আমার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যেমন আপনি ঘরের নিচে চাপা পড়েও কীভাবে জীবিত বেড়িয়ে আসলেন। তাই এই অধম হুযূরের সমীপে নিবেদন করলাম, আমাকে আহমদী মিস্ত্রী আল্লাহ্ বখ্‌শ সাহেবের চারপাই (খাট) রক্ষা করেছে। যা একটা ভারি দেয়ালকে নিজের উপর উঠিয়ে রেখেছিল। যারফলে আমি বোঝার তলে চাপা পড়িনি। এভাবে হুযূর আহমদীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন আর আমি সব বন্ধুর সুরক্ষিত থাকার বিষয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করলাম। অথচ হুযূর (আ.)-এর পূর্বেই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, ভূমিকম্পে আমাদের জামাতের একজন লোকও মারা যায়নি। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, হুযূর (আ.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। কেননা আমার পূর্বে কোন আহমদী ধরমশালা থেকে হুযূরের নিকট পৌঁছেনি। ধরমশালা থেকে কোন আহমদীও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেনি, আর প্রথম আহমদী তিনিই এসেছিলেন, তাঁর নিকট থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুরো বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে অবগত হয়েছেন। অথচ কোন আহমদীর এই ভূমিকম্পে কোন ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি বলে হুযূর পূর্বে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলছেন, অতএব হুযূরের এই অধমের সাথে সাক্ষাত কাংড়ার ভূমিকম্পের পরই হয়েছে। হুযূর এ ঘটনায় আহমদীদের প্রাণে বেঁচে যাওয়াকে একটি নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ করে, আমার ভূমিকম্পে চাঁপা পড়া সত্ত্বেও বেঁচে যাওয়া একটি নিদর্শন ছিল, যা লিখিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কল্যাণমন্ডিত তারাই, যারা জ্যাজ্বল্যমান নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং খোদা তা'লার মহাপুরুষের প্রতি ঈমান আনে।

হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকীম সাহেব বর্ণনা করেন, হঠাৎ মৌলভী বদরুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়, যিনি শহরের একটা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান ছিলেন। তিনি আমাকে আল্ হাকাম পত্রিকা পড়তে দিলেন। আমার মনে আছে, আল্ হাকাম পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'খোদা তা'লার তাজা ওহী এবং যুগ ইমামের পবিত্র বাণী' এই দু'শিরোনামে লিখা হত। প্রথম পৃষ্ঠায় এই দু'টি বিষয় থাকতো। তিনি বলছেন, আমি এটা পড়তাম আর আমার হৃদয়ে এমন ভালবাসার আকর্ষণ সৃষ্টি হতো যে, তাৎক্ষণিক ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হবার বাসনা জাগত। আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হলাম আর আহ্‌লে- হাদীসের মৌলভীদের বিভ্রান্তি ও প্ররোচনা সত্ত্বেও আমি অল্প দিনের মধ্যেই আহমদীয়াত গ্রহণ করি। মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব আমাকে দ্রুত কাদিয়ানে যাবার পরামর্শ দেন। আর আমার সাথে আর এক আহ্‌লে-হাদীস মৌলভী ও প্রস্তুতি নিলো। তিনি আহ্‌লে-হাদীস মৌলভী, মৌলভী সুতলান মাহমুদ সাহেবের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তিনি লিখছেন, ঐ সময় আমার বেতন ছিল পনের রূপী, আর আমি অস্বচ্ছল ছিলাম। আমি ছুটি নিলাম। যেহেতু আমার রেলওয়ের পাসেরও অধিকার ছিল না, তাই আমি আমার আরেক বন্ধু সহ অমৃতসরের টিকেট নিলাম। কেননা আমাদের নিকট কাদিয়ান যাবার পুরো ভাড়া ছিল না। অমৃতসরে পৌঁছে আমাদের টিকেট শেষ হয়ে যায়। আর আমাদের বাটালাগামী গাড়িতে আরোহন করার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে ছিল শুধুমাত্র আটআনা, তাই আমরা ভিড়কে পর্যন্ত যাবার জন্য দু' আনার টিকেট নিলাম আর গাড়িতে আরোহন করলাম। ভিড়কে স্টেশনে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের টিকেট শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমরা নামলাম না, আর গাড়ি চলতে লাগলো। যখন অপর স্টেশনের উদ্দেশ্যে গাড়ি চলছিল, তখন রেলওয়ের এক কর্মকর্তা টিকেট চেকিং করতে আসলো এবং সব যাত্রীর টিকেট দেখা শুরু করলো। যেহেতু আমাদের টিকেট ছিল আগের স্টেশন পর্যন্ত আর আমাদের কাছে কোন টাকাও ছিল না, আমরা দু'জন অপমান-অপদস্ত হবার ভয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ছিলাম। আল্লাহ্‌র আঁচল ধরা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমরা দু'জন মিলে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করলাম, আমরা তোমার সত্য মসীহ্‌র নিকট যাচ্ছি, আমাদের কাছে কিছুই নেই; তুমি তোমার প্রিয় প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র খাতিরে আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখো, আর আমাদেরকে অপমান-অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করলেন। রেলওয়ের কর্মচারী যখন আমাদের নিকট টিকিট চাইল, তখন আমাদের কাছে পূর্বের ষ্টেশনের যে টিকেট ছিল তা তাকে দিয়ে দিলাম। আমার খুব ভাল ভাবে স্মরণ আছে, তিনি সেই টিকেটটি খুব ভালভাবে চেক করে আমাকে ফেরত দিয়েছেন, কিন্তু আমাদেরকে কিছুই বলেন নি এবং অন্য-বগীতে চলে যান। এটি আমাদের জন্য একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য এবং পবিত্র-মসীহ্‌র জন্য আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখলেন, আর আমাদেরকে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। এই ঘটনাটি আমাদের জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আমাদের

নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বাটালা থেকে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হই, আর যোহরের নামাযের সময় কাদিয়ান দারুল আমান পৌঁছে যাই।

হযরত আল্লাহ্ দেত্তা হেডমাস্টার সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সহস্র মৃত্যু এবং বিপদাবলী থেকে অসাধারণভাবে রক্ষা করেছেন। আমি সাপ ধরেছি, সাপ মাড়িয়েছি এবং সাপ আমার উপর উঠেছে কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অল্পের জন্য রক্ষা করেছেন।

হযরত মাস্টার ওধাভে খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, অমৃতসরের ঘটনা। একবার এখানে প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করল। একদিন আমি স্কুল থেকে ঘরে আসি। তখন আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের ঘরে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। আর এ কারণে তিনি ভীতি প্রকাশ করলেন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললাম, চিন্তা করো না, আমাদের জামাত প্লেগ থেকে নিরাপদ থাকবে, আর কোন ভয় নেই। এরপর আমি ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করি। দ্বিতীয় দিন পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটল এবং ইঁদুরের সাথে অনেক পোকা মাকড়ও ছিল। আমি পুনরায় তা পরিষ্কার করলাম এবং স্ত্রীকে এ বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, কোন চিন্তা করো না। আমাদের জামাত এথেকে নিরাপদ থাকবে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন পর রাত ১২টার পর আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, আমার শরীরে ফোড়া বের হয়েছে– অর্থাৎ প্লেগের ফোঁড়া বের হয়েছে। আমি তাকে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলাম, শঙ্কিত হবে না। আমি সকালেই হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখবো। অতএব আমি সকালেই চিঠি লিখলাম। আমার মনে আছে, সেই চিঠি কাদিয়ানে পৌঁছার পূর্বেই প্লেগের ফোঁড়া মিশে গেল। আর আমার স্ত্রী একেবারেই সুস্থ হয়ে গেলেন। এভাবেই পুনরায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমার এক বছর বয়স্ক ছেলে আব্দুল করীমের প্লেগের ফোঁড়া বের হলো। আমি পুনরায় হুযূরের খিদমতে দোয়ার জন্য চিঠি লিখলাম এবং পরিবারের সবাইকে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলাম। অতঃপর সেই ফোঁড়াও আপনা-আপনি মিশে গেল। সে সময় প্লেগ-রোগ এত ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রতিদিন দু'আড়াইশত মানুষ এ রোগের আক্রমনে মারা যেতো। আর এ মৃত্যুর কথা প্রতিদিন কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হতো। এ বিষয়ে এটি স্পষ্ট করতে চাই- যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। হয়তো তাদের কাছে তা পৌঁছেনি অথবা তারা সেটি সঠিকভাবে বুঝে নি। নতুবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে যে-নির্দেশই আসতো, সাহাবারা তাৎক্ষণিকভাবে তা মানার চেষ্টা করতেন। হতে পারে, সেই নির্দেশ আসতে হয়ত বিলম্ব হয়েছে অথবা এটি পরের ঘটনা হবে বা পূর্বের। যাহোক এটি নিঃসন্দেহে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঈমানকেও দৃঢ় করেছেন আর স্ত্রী-সন্তানদের ঈমানকেও মজবুত করেছেন। যখন প্রতিটি এলাকার প্রতিটি স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে-সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাহলো, **'আমার নির্দেশ হচ্ছে, লাহোরের বন্ধুগণ বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিন। যাদের বাড়ীতে ইঁদুর মরবে এবং যাদের নিকটবর্তী কেউ অসুস্থ হবে, তাৎক্ষণিকভাবে সেই বাড়ী ছেড়ে দেয়া উচিত'। তারা ধরে নিয়েছেন, এই নির্দেশ শুধু লাহেরের জন্য ছিল। কিন্তু এটি একটি সাধারণ নির্দেশ ছিল। মহামারী আকারে যেসব রোগ দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া উচিত, তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।** তিনি (আ.) বলেন, **'তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ী ঘর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং শহর ছেড়ে বাহিরে খোলা মাঠে চলে যাওয়া উচিত। খোদা তা'লার নির্দেশ, তাই বাহ্যিক উপকরণকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্লেগ হোক আর না হোক, ময়লা, ঘিঞ্জি ও অন্ধকার গৃহে এমনিতেই থাকা নিষেধ।** সব ধরনের নোংরামী পরিহার করা উচিত। কাপড় চোপড়, স্থান ও শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, পবিত্র রাখা দরকার এবং দোয়া ও ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত। এগুলো আবশ্যকীয় বিষয়'। পরে আবার বলেন, 'হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও প্লেগ হয়েছিল। এক জায়গায় মুসলমানদের সৈন্যদল গিয়েছিল। সেখানে ভয়াবহ প্লেগ দেখা দেয়। যখন মদীনা শরীফে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন, এই জায়গা ছেড়ে কোন উঁচু পাহাড়ে চলে যাও। আর এভাবে সৈন্যদল রক্ষা পেল। সে সময় এক ব্যক্তি আপত্তিও করল, আপনি কি খোদা তা'লার নিয়তি থেকে পলায়ন করছেন। তিনি বলেন, আমি খোদা তা'লার এক তকদির থেকে আর এক তকদিরের দিকে যাচ্ছি। এমন কি, কোন বিষয় আছে, যা খোদা তা'লার বিধানের বাহিরে? অতএব এটি হল সাধারণ দিক-নির্দেশনা। জেনে-বুঝে নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া উচিত নয়'। অতঃপর এও বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দু'টি ওয়াদাই আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে করেছেন। প্রথমতঃ এই গৃহে যারা বসবাস করবে তিনি তাদেরকে প্লেগ থেকে রক্ষা করবেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, "ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান্ ফিদ্দার"। তাঁর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি আমাদের জামাত সম্পর্কে, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (সূরা আল্ আন'আম:৮৩)। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, এদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এখানে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, জামাতের সেসব লোককে রক্ষা করা হবে, যারা পরিপূর্ণভাবে আমাদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলবে এবং তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি এবং নিজেদের সংশোধন করবে। আর প্রবৃত্তির সহজাত মন্দ প্রবণতার দিকে ঝুঁকবে না। অনেক এমন লোক রয়েছে, যারা বয়আত করে ঠিকই, কিন্তু কর্মের সংশোধন করে না। শুধু হাতে হাত দিয়ে লাভ কি? খোদা তা'লা অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত অবগত রয়েছেন'।

কাজেই এ' হল সে দু'টি বিষয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যার প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রত্যেক ধরনের সমস্যা, বিপদাবলী, প্রত্যেক ধরনের মহামারী থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ঈমানের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, আমরা চিন্তা করা দরকার যে, ঈমানে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি?

হযরত মৌলভী সুফী আতা মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার জন্য সাক্ষাত করা কঠিন ছিল [অর্থাৎ তাঁর অবস্থার কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করা দুরূহ ছিল], কেননা ছুটি পাওয়া যেত না। ঘটনাক্রমে পত্রিকায় পড়েছি যে, হযরত আকদাস জেহলাম আসছেন। আমার অবশ্য জেহ্লাম যাওয়ারও অনুমতি হবে না, কিন্তু আমি খুবই অস্থির ছিলাম। আমি পরিবার পরিজনকে বললাম, আগামীকাল রবিবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জেহলাম আসছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি। তোমরা কাউকে বলবে না। সময় খুব সংকীর্ণ ছিল আর স্টেশন ছিল তিন মাইল দূরে। রাস্তা ছিল পাহাড়ী আর সময় ছিল রা॥ যেখানে দিনের বেলাতেই যাতায়াতের জন্য পথটি ছিল দুর্গম। আমি খোদা তা'লার উপর ভরসা করে যাত্রা

শুরু করলাম। যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন গাড়ী ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। টিকিট নিলাম জেহ্‌লাম পৌঁছলাম এবং হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলাম।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব বর্ণনা করেন, আমি সে সময় টগবগে যুবক ছিলাম। কপুরথলায় এক রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখ্‌লাম-আমি একটি হাতির নিচে চাপা পড়েছি আর সেটির পেট আমার উপর। যখন সকাল হল, তখন আব্দুল মজীদ খাঁন সাহেব আমাকে বলেন, আজ বিয়াস নদীতে বন্যা এসেছে, আমরা ভ্রমণ ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নদী দেখ্‌তে সেখানে হাতির পিঠে চড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি বললাম, আমি যেতে পারব না, আর এর কারণ হচ্ছে, আজ রাতে আমি একটি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখেছি-আমি হাতির নিচে চাপা পড়েছি। কিন্তু তিনি এ স্বপ্ন শুনেও উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকেন, আর আমি বার বার অস্বীকার করতে থাকি। কেননা আমার হৃদয়ে এ স্বপ্নের যথেষ্ট অপ্রীতিকর ও ভীতিপ্রদ প্রভাব বিরাজমান ছিল। আমি যখন খাঁন সাহেবের মুখে এ বাক্য শুনলাম যে-হাতিতে চড়ে নদীতে যাব, তখন হাতির কথা শুনে আমার হৃদয়ে সে-স্বপ্নের প্রভাব আরো গভীরভাবে অনূভুত হয়। এরপর আমি আরো দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করি আর (তাদের) সাথে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। তারপর আরো কয়েকজন বন্ধুও খাঁন সাহেবের সাথে যাবার জন্য জোর দিতে থাকেন। তাদের অত্যাধিক জোরাজুরির কারণে আমি ভাবলাম-নিয়তি এটিই নির্ধারিত মনে হয়, যা ঘটার তাই ঘটবে। তখন আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। বন্ধুগণ কয়েকটি হাতি প্রস্তুত করলেন, তিন বা চারটি হাতি হবে, যাতে বন্ধুরা চড়ে বসলেন। উল্লেখিত খাঁন সাহেব নিজের সাথে একটি হাতিতে আমাকেও বসালেন। নদীর তীরে পৌঁছলে ভাগ্য ও নিয়তি বাহ্যিক হাতির মাধ্যমে সেই ভীতপ্রদ স্বপ্ন প্রকাশ হতে দেয়নি বরং তা অন্য একটি রূপ ধারণ করল। আমরা যখন তীরে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য দেখছিলাম, তখন এই প্রবল বন্যার মাঝে একজন যুবককে দেখলাম, সে সেতুর উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পুলের তলা দিয়ে তীরের নিকটবর্তী স্তম্ভ ঘেষে (সেতুর তলায় বেশ কয়েকটি স্তম্ভ হয়ে থাকে) অপর প্রান্তে বেরিয়ে আসছে। আমিও সাঁতার জানতাম। আমি তাকে বললাম, ভাই! তুমি তো তীরের নিকটবর্তী স্তম্ভ অতিক্রম করছ, যদি তুমি দূরের স্তম্ভ অতিক্রম করে দেখাতে পার, তবে তোমার দক্ষতা মানবো। সে বললো নদীতে প্রমত্ত ভাব বিরাজ করছে। বন্যার সময়, তাই এ সময় সেতুর নীচ দিয়ে দূরের ফটক অতিক্রম করা অনেক কঠিন। আমি বললাম, সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি সাঁতার জানেন কী? আমি বললাম হ্যাঁ, জানি। তখন সে বলল, তা হলে আপনি অতিক্রম করে দেখান। আমি বললাম বেশ ভাল কথা, আমি মালকোচা মেরে দূরের স্তম্ভ দিয়ে অতিক্রম করার জন্য লাফ দিতে লাগলাম। প্রথম বার আমি পুলের তালা দিয়ে অনায়াসে চলে যাই। দ্বিতীয় বার পুনরায় আরও দূর থেকে অতিক্রমের জন্য লাফ দেই, আর ঘটনাচক্রে সেতুর উপর থেকে আমি লাফ দিয়ে যেখানে পড়ি, সেটি ছিল বড় ধরনের পানির ঘূর্ণি এবং পাকের জায়গা। অর্থাৎ সে জায়গায় অনেক বড় ঘূর্ণি ছিল। এখানে পানি চাকার ন্যায় অনেক বড় আকারে পাক খাচ্ছিল। আমি লাফ দিতেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাই আর সেখান থেকে বের হবার সবার্ত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। শেষে আমি ঘূর্ণির ভেতর পানির শক্তিশালী চাপের মাঝে চাপা পড়ি। বাহ্যতঃ আমার পক্ষে উক্ত ঘূর্ণি থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। আমার মোকাবিলা করার সর্ব শক্তি ব্যর্থ দেখাচ্ছিল। আমার এমন মনে হল, এখন দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ। সে সময় যেসব বন্ধু সেতুর উপর থেকে আমার অবস্থা অবলোকন করছিলেন, তারা চিৎকার করতে থাকলেন, হায় পরিতাপ! মৌলভী সাহেব ঘূর্ণিতে আটকে মারা যাচ্ছেন।

সে সময় নিয়তির লিখন এটিই মনে হচ্ছিল। বন্ধুগণ কান্নাকাটি ও চিৎকার ঠিকই করছিলেন, আমি ডুবে যাচ্ছি। কিন্তু তাদের মাথায় এ বিষয়টি আসেনি যে, যদি তারা কেবল পাগড়ী খুলেই আমার দিকে ছুড়ে দিতেন তাহলেও কমপক্ষে পাগড়ীর একটি প্রান্ত ধরে আমি বাঁচার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু কারো মাথায় এ-বুদ্ধি আসেনি। তখন আমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, জাগতিক উপকরণের দিক থেকে পরিস্থিতি নৈরাশ্যকর। এরূপ মনে হচ্ছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনাবসান ঘটবে আর আমি শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছি। ততক্ষণে খোদার তকদীর ভিন্ন রূপ নেয়। উপকরণের স্রষ্টা খোদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে, যার অনুমতি ও নির্দেশে খাকসার কপুরথলা সফরে গিয়েছিল, আমার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ন নতুন একটি ঐশী-শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর সেটা এভাবে ঘটে–আমি পানির যে ঘূর্ণিপাকে আটকে গিয়েছিলাম, তাতে কখনো আমার মাথা পানির নীচে আবার কখনো পানির উপরে উঠে আসছিল, কখনো আমি পানির নীচে কখনো উপরে মাথা বের করছিলাম। যা ঘটছিল, তা সম্পূর্ণ আমার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। পানি তখন প্রবল বেগ ও শক্তির সাথে আমার উপর প্রভুত্ব করছিল। তখন হঠাৎ করে কোন শক্তিশালী হাত আমাকে সেই ঘূর্ণিপাকের কবল থেকে সজোরে এত দুরে নিক্ষেপ করে যে, নদীর তীরে একটি বড় বাবলা গাছের ডাল কেবল খোদার অলৌকিক সাহায্যে আমার হাতে আসে, যার শাখা নদীর পাড় থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সেই ডালের সাহায্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে নীরবে বিশ্রাম নিলাম। অতঃপর কেবল পরম দয়ালু খোদার কৃপা ও দয়ায় আমি নিরাপদে তীরে পৌঁছাই। তখন আমার সম্মুখে সেই স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা সুস্পস্ট হয়ে যায়। তখন আমি বুঝতে পেরেছি, খোদার তকদীর স্বপ্নে হাতির নীচে চাপা পড়ার অর্থ অন্য কোন বিপদের আকারে প্রকাশ করে দেয়। সেই সফরে আমরা হাতির পিঠে চড়েই নদীর তীরে পৌঁছাই। কিন্তু স্বপ্নের ভীতিপ্রদ দিকটি হাতির স্থলে নদীর দুর্ঘটনার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই তাঁর অনুমতি ও নির্দেশে কপুরথলায় আগমন ও ধর্মের সেবায় তবলীগের কাজ করার ফলেই আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছি। অন্যথায় উপায়-উপকরণের দিক থেকে অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নৈরাশ্যজনক ছিল।

এসব ঘটনায় সাহাবাদের ঈমানের চিত্র এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মৌলবী সাহেব যেভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যদি কোন দুনিয়ার-কীট হত, তাহলে একে কাকতালীয় ঘটনা বলতো, কাকতালীয়ভাবে নদী আমাকে বাহিরে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু হযরত মৌলভী সাহেব ধর্মের জন্য সফর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াকে মুক্তির কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ হচ্ছে সেই ঈমানী-অবস্থা, যা আমাদের সবার মাঝে সৃষ্টি হওয়া চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

30th April 2012
PRESS RELEASE

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

New Mosque Opened by World Muslim Leader in Manchester

The Darul Amaan Mosque inaugurated by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

The Ahmadiyya Muslim Jamaat is pleased to announce that on 27 April 2012, its world leader, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Fifth Khalifa of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, inaugurated the new Darul Amaan Mosque in the City of Manchester, United Kingdom. This was the sixth new Mosque inaugurated by His Holiness in the United Kingdom in 2012.

The Mosque was opened when His Holiness led the Friday Sermon, which was broadcast globally on MTA International. During his sermon, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad reminded the worshippers that it was not enough simply to build a Mosque, but that it ought to be filled with sincere worshippers of God Almighty.

Later in the day, His Holiness held a private meeting with local dignitaries. Thereafter an official reception to mark the opening of the Mosque was held at the Mosque premises, which was attended by dignitaries and guests from various backgrounds.

In his welcome address, Dr Naseer Choudhry, the Regional President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat informed that the Mosque could hold up to 2,000 worshippers. He added that the Mosque was entirely funded by members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat.

Councillor Harry Lyons, the Lord Mayor of Manchester, said he was delighted that the Mosque had been situated at a site which was only a few hundred metres from where he had been born and brought up. He said that the Ahmadiyya Muslim Jamaat had the ‘ full support of the Manchester City Council’ .

Tony Lloyd, MP for Manchester Central, said he had a long standing relationship with the Ahmadiyya Muslim Jamaat. He said that under the leadership of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Ahmadi Muslims constantly displayed values of love and peace.

Kate Green, MP for Stretford and Urmston, said the new Mosque was a 'beautiful' addition to Manchester and she congratulated the Ahmadiyya Community on the inauguration of Darul Amaan.

Sir Gerald Kaufman, MP for Manchester Gorton, said that though he had been a Member of Parliament for forty-two years, attending the opening of the Darul Amaan Mosque ranked amongst his personal highlights. He concluded by saying that he prayed 'that God continues to smile upon your Community'.

John Leech, MP for Manchester Withington, said the new Mosque stood as a 'beacon' amongst all the other buildings in the area and was a wonderful addition to the landscape. He congratulated the Community for having raised the funds for the Mosque on its own and in such a quick time.

he highlight of the evening was the keynote address given by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, in which he outlined the true objectives of a Mosque in Islam. He also used his address to promote inter-faith harmony and integration between people of all backgrounds.

His Holiness said that people generally limited themselves to the company of people of similar interests and backgrounds but that it was essential that people of all backgrounds came together so that a unified society could be built.

His Holiness said:

"It is a source of great pleasure to me that Ahmadi Muslims do not remain hidden away and isolated, but in fact endeavour to form relations with all segments of society and make efforts to integrate and interact with people from all walks of life. And certainly this ought to be the hallmark of every true Ahmadi Muslim."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said that in the West the majority of people held a fear of Islam and of Mosques in general. He said that people had no need to fear true Mosques because they were a place to worship God and to encourage all people to serve humanity and to act with justice.

His Holiness said:

"How can it be, that a person whose life is governed by the teachings of the Holy Qur'an and

whose sole aim is to acquire God's pleasure, that he could ever cause any form of disorder or strife in society? And furthermore, how can it be that in a Mosque a Muslim learns to usurp the rights of other people? This could never happen because it directly contravenes the teachings of Islam."

His Holiness used his address to reassure all those in attendance that Ahmadi Mosques were true Mosques and thus were a place of safety and peace. His Holiness said:

"It is with complete conviction and confidence that I say to all of you that the only message that that you will ever hear from an Ahmadi Mosque is a call urging people towards God Almighty, and a call to fulfil the rights of God's Creation."

His Holiness concluded by stating that the name of the Mosque he was inaugurating actually meant a 'place of peace and security' and thus it would be a means of protection not just for those who enter it but those who surround it.

His Holiness said:

"Certainly, the local people of this area will find that all Ahmadis will always remain at the forefront of every effort that is made towards transforming hatred and enmity into love and peace. Thus I hope and very much expect that this mosque will become a symbol of peace and a beacon of light not just in the local area but for the entire city and indeed the wider world."

Press Secretary AMJ International

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

৩০ এপ্রিল ২০১২
প্রেস রিলিজ

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

বিশ্ব মুসলিম নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেষ্টারে

নূতন মসজিদ 'দারুল আমান'-এর ঐতিহাসিক উদ্বোধন করেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিগত ২৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেষ্টার সিটিতে নূতন মসজিদ 'দারুল আমান'- এর শুভ উদ্বোধন করেন। এটা হলো যুক্তরাজ্যে হুযূর (আই.) কর্তৃক ২০১২ সনে উদ্বোধনকৃত ষষ্ঠ নূতন মসজিদ।

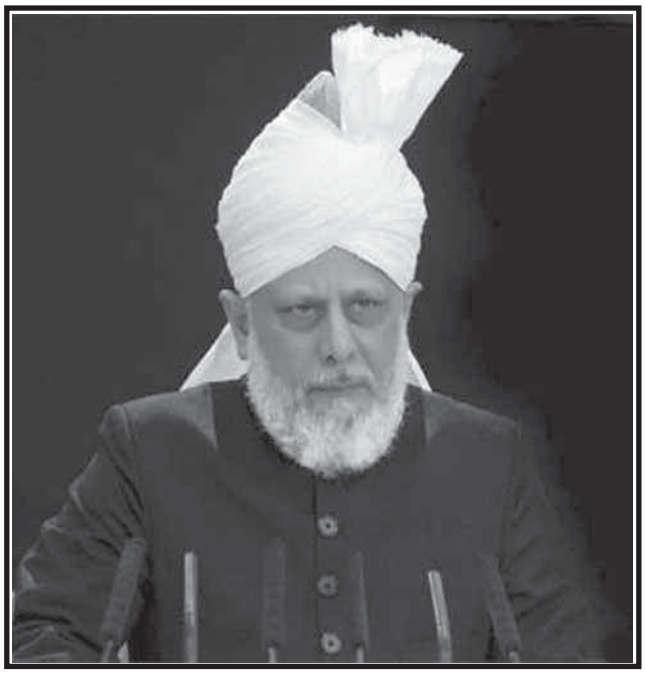

হুযুর জুমুআর খুতবা দান করার মাধ্যমে এই মসজিদটি উদ্বোধন করেন, যা এম.টি.এ এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচার করা হয়। খুতবা চলাকালে হুযূর (আই.) হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ নামাযীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, কেবল মসজদি বানানোই যথেষ্ট নয়, বরং এটা সর্ব শক্তিমান খোদার একনিষ্ঠ এবাদতকারীদের দ্বারা পূর্ণ হওয়া উচিত।

দিনের শেষ ভাগে হুযূর (আই.) স্থানীয় উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। এরপর মসজিদটির উদ্বোধনকে স্মরনীয় করতে মসজিদ প্রাঙ্গনে সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ের একটি অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে বিভিন্ন উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত-ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট ডা: নাসির চৌধুরী অবহিত করেন যে, মসজিদটি ২০০০ সংখ্যক মুসল্লি ধারণ করতে পারে। তিনি আরো জানান যে, মসজিদটির নির্মাণ ব্যয় সম্পূর্ণভাবেই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাহ হয়েছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর হ্যারি লায়ন্স এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেন যে, মসজিদটি এমন এক স্থানে স্থাপিত হয়েছে, যে স্থানটি তার জন্ম ও বেড়ে উঠার স্থান থেকে মাত্র কয়েকশ' মিটার দূরত্বে অবস্থিত। তিনি বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি কাউন্সিলের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার সেন্ট্রাল-এর এম,পি টনি লয়েড বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি বলেন যে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদের নেতৃত্বে আহমদী মুসলমানরা অবিরত ভাবে ভালবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে কাজ করছে।

ষ্ট্রেটফোর্ড ও আর্মষ্টন-এর এম, পি. কেইট গ্রীন বলেন, নূতন মসজিদটি ম্যাঞ্চেষ্টারের এক 'সুন্দর' সংযোজন এবং 'দারুল আমান'-মসজিদের উদ্বোধনীতে উপস্থিত হতে পেরে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা উন্নীত হয়েছে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, আপনাদের জামাতের উপর খোদা সদা-সর্বদা সন্তুষ্ট থাকুন।

ম্যাঞ্চেষ্টার হুই টিংটন এর এম.পি. জন লীচ নূতন এ মসজিদটিকে এলাকার অন্যান্য ইমারতের মধ্যে এক 'আলোক-সঙ্কেত' হিসেবে দাড়িয়ে রয়েছে' এবং 'এক আশ্চর্যজনক ভূ-চিত্রের সংযোজন' বলে মন্তব্য করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে মসজিদের তহবিল সংগ্রহের জন্যে তিনি জামাতকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল বক্তৃতাটি ছিল বিকালের অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট, যাতে তিনি ইসলামে মসজিদের আসল উদ্দেশ্য কি-তা বর্ণনা করেন। তার বক্তৃতায় তিনি আন্ত:ধর্মীয় ঐক্য এবং সব-পটভূমির লোকদের মধ্যকার অখন্ডতা

মজবুত করার উপর জোর দেন।

হুযূর (আই.) বলেন যে, মানুষ সাধারণভাবে নিজদেরকে একই স্বার্থ ও পটভূমি সংশ্লিষ্ট লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যা জরুরী, তা হচ্ছে সব পটভূমির লোকদেরই একত্রিত হওয়া যাতে একটি সম্মিলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

হুযূর (আই.) আরও বলেন : 'আমার জন্যে এটা এক মহা আনন্দের বিষয় যে, আহমদী মুসলমানরা লুক্কায়িত এবং নিঃসঙ্গ থাকে না, বরং সমাজের সব অংশে সম্পর্ক গড়ার জন্যে তারা অবিরত প্রচেষ্টা চালায় এবং জীবনের সব অংগনের লোকদের সাথে অখন্ডতা ও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল হতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এবং নিশ্চিতভাবে এটাই হওয়া প্রত্যেক খাঁটি আহমদী মুসলমানের জন্যে উৎকর্ষ-নির্দেশক এক ছাপ'।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই সাধারণভাবে ইসলাম ও মসজিদ সমূহের প্রতি ভীতি পোষণ করে আসছে। তিনি বলেন যে, সত্য হলো-মসজিদ সমূহের প্রতি ভীতি পোষণ করার কোনই কারণ ছিল না, কারণ ওগুলো ছিল খোদার এবাদতের স্থান এবং সব মানুষকে মানবতার সেবা এবং ন্যায়-বিচারের সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

হুযূর (আই.) বলেন : 'এটা কিভাবে হতে পারে যে, একজন লোক, যার জীবনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে পরিচালিত এবং যার একমত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা, সেমতাবস্থায় সে কি সমাজে অশান্তি অথবা বিবাদ ঘটাতে পারে? উপরন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে, একটি মসজিদে একজন মুসলমান অন্যান্য লোকের অধিকারে হস্তেক্ষেপ করা শিখবে? এমনটা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ এটা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী'।

হুযূর (আই.) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আহমদী মসজিদগুলোই হচ্ছে আসল মসজিদ এবং সেকারণে নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান। হুযূর (আই.) বলেন: 'আপনাদের সবাইকে আমি পূর্ণ প্রত্যয় ও দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, একটি আহমদী মসজিদ থেকে আপনারা সর্বদাই এমন আহ্বান শুনবেন, যেটা মানুষকে সর্বশক্তিমান খোদার সৃষ্টি জীবের অধিকারকে পূর্ণ করে'।

বক্তৃতার উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন যে, তিনি যে মসজিদটি উদ্বোধন করলেন, সেটার নামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান'- এবং এভাবে এটা কেবল তাদের জন্যেই সুরক্ষার উপায় হওয়া উচিত নয়, যারা এটাতে প্রবেশ করে, বরং তাদের জন্যেও প্রতিরক্ষার স্থান হওয়া উচিত, যারা এর চার পাশে অবস্থান করে।

হুযূর (আই.) বলেন, 'এই এলাকার স্থানীয় লোকেরা অবশ্য দেখতে পাবে যে, সব আহমদীরা সর্বদা প্রত্যেক সেই সব প্রচেষ্টার অগ্রভাগে থাকবে, যেগুলো ঘৃণা ও শত্রুতাকে ভালবাসা ও শান্তিতে রূপান্তরের কাজে গৃহীত হবে। এভাবে আমি এ আশা এবং খুব বেশী করে প্রত্যাশা করি যে, এই মসজিদটি একটি 'শান্তির প্রতীক'-এবং একটি 'আলোক-বর্তিকা'-য় পরিণত হবে, আর তা কেবল স্থানীয় এলাকাতেই নয়, বরং সম্পূর্ণ নগরেই এবং বাস্তাবিক পক্ষে বৃহত্তর বিশ্বেই"।

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

জুমুআর খুতবা

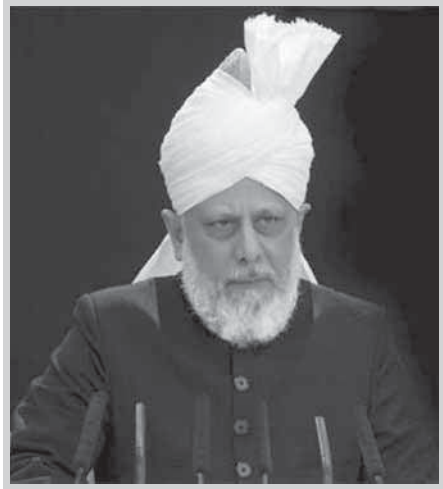

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৬ এপ্রিল ২০১২-এর (৬ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * (সূরা আলে ইমরান: ১৭০-১৭৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমি খোদা তা'লার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ! কেননা এমন সদস্যও রয়েছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান এনেছেন, নিষ্ঠার সাথে এ পথ অবলম্বন করেছেন এবং এ পথে সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছেন'।

শহীদ মরহুম আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের স্মৃতিচারণ

উপরোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তুমি কখনো তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে জীবিত এবং তাদের রিয্ক দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন, তারা এতে উৎফুল্ল। আর যারা তাদের পিছনে (দুনিয়ার) রয়ে গেছে (এবং) এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি, এদের সম্বন্ধেও তারা সুসংবাদ পায়। এদের কোন ভয় নেই এবং এরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না। আল্লাহ্‌র পথ থেকে তারা অনুগ্রহ ও আশিস লাভের সুসংবাদ পায় এবং এ (সুসংবাদও পায়) আল্লাহ্ মু'মিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। আহত হবার পরও যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মাঝে যারা ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, এদের জন্য রয়েছে এক মহা-পুরস্কার, (অর্থাৎ) যাদেরকে লোকেরা বলেছিলো, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বললো, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক।

পাকিস্তান এবং তাদের প্রভাবে অন্য কয়েকটি দেশের মোল্লারা ও তাদের সরকার মনে করে যে, আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে, তাদেরকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন সমূহ অগ্রাহ্য করে, সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যে পরিণত করে, আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্য সবাইকে প্রকাশ্যে অনুমতি প্রদান করে এরা আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু এটি তাদের ভুল ধারণা। আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার স্বহস্তে রোপিত সেই বৃক্ষ, যাকে কোন মানবীয় অপচেষ্টায় উৎপাটন করা সম্ভব নয়। এই বৃক্ষের বৃদ্ধি ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হবার সুসংবাদ খোদা তা'লা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম (ঐশী বাণী) হলো: **"বুশরা লাকা ইয়া আহমদী! আনতা মুরাদী ও মা'য়ী, গারাছতু লাকা কুদরাতী ওয়া ইয়াদী।"** এর অনুবাদ হচ্ছে, 'হে আমার আহমদ! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি আমার উদ্দেশ্য এবং আমার সাথে আছ। আমি নিজ হাতে তোমারূপী বৃক্ষ রোপণ করেছি।'

অতএব নিঃসন্দেহে এ জামাতকে ধ্বংস করার মানবীয় অপচেষ্টা চলছে এবং চলবে। কিন্তু এসব অপচেষ্টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধ্বংস হতে পারে না। যখন উপরোক্ত ইলহামটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে গুটিকতক ভক্ত ছিলেন মাত্র, যারা

তাঁর হাতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আজ আমরা কত মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখছি! পৃথিবীর দুশ'টি দেশ-পর্যন্ত আহমদীয়া জামাত প্রসার লাভ করেছে। নিষ্ঠাবানদের সমন্বয়ে এমন এমন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দেখে অবাক হতে হয়। বিরোধীদের সব ধরনের অপচেষ্টা সত্ত্বেও, যাতে প্রশাসনেরও ভূমিকা রয়েছে; প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে উন্নতি হয়েছে, তা কি কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফসল হতে পারে? যদি কারো বিবেক-বুদ্ধি থাকে এবং চোখে যদি বিদ্বেষের পর্দা না থাকে, তবে এই একটি বিষয়ই আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **কতক এমন লোক মাথাচাড়া দেয় এবং দাবী করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের স্বপ্নে জানিয়েছেন বা আমাদের প্রতি ইলহাম হয়েছে, 'মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী। তিনি বরং অন্য ধর্মাবলম্বীদের উদাহরণ দিয়েও বলেছেন, তারাও বলে- আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জানিয়েছেন, 'আমাদের ধর্ম সত্য এবং ইসলাম মিথ্যা' নাউযুবিল্লাহ্'।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এমনও অসংখ্য লোক রয়েছেন যারা বয়আত করেছেন এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অবহিত করেছেন এবং পথের দিশা দিয়ে বলেছেন, এই ব্যক্তির মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি সত্য।'** বরং আজও শত শত মানুষ স্বপ্নে পথনির্দেশনা পেয়ে বয়আত করেন। বর্তমানে আমরা স্বয়ং এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এমন অনেক ঘটনা আমি উপস্থাপন করেছি। বরং এখানেই হয়তো আমার সম্মুখে এমন অনেক লোক হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে বলেছেন, **'আল্লাহ্ একাধিক হতে পারেন না যে, কাউকে কিছু বলবেন আর কাউকে অন্য কিছু আর বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পথ দেখাবেন। তাঁর একটি মানদন্ড আছে। কেউ একে যাচাই করতে চাইলে যাচাই করে দেখতে পারে, আর এটিই একমাত্র মাপকাঠি'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **'আমি তোমাদের বলছি, সেই মানদন্ডটি কী? তোমরা দেখো! আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কি বলে? এও স্বপ্ন দেখেছে, সেও স্বপ্ন দেখেছে, এখন দেখো আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য কি বলে? এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের উন্নতি বলে, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য আহমদীয়া জামাতের অনুকূলে রয়েছে। বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের খলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাও আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি সাক্ষ্য। নিঃস্বার্থভাবে** (জামাতের সদস্যদের) **প্রাণ, ধন ও সময়ের কুরবানীর কথা সকল অ-আহমদী স্বীকার করে। এগুলো কি তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য নয়, যিনি জগদ্বাসীর অত্যাচার সত্ত্বেও হৃদয়গুলোকে একসূত্রে দৃঢ়ভাবে গেঁথে ত্যাগের প্রেরণা জুগিয়েছেন'?**

অতএব বিরোধীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা– জামাতের শক্তি অর্জন, বিস্তার ও উন্নতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। প্রতিটি জীবন, যা আহমদীয়াত, কালেমা তৈয়্যেবা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ্ তা'লা, আর শুধু আল্লাহ্ তা'লার দাসত্ব বরণের জন্য উৎসর্গ হচ্ছে, তা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করে যে, তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র, নিপীড়ন ও নির্যাতন আহমদীয়া জামাতের উন্নতিকে প্রতিহত করতে পারবে না।

জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে শহীদ হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁন সাহেব এবং শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের মাধ্যমে জীবন উৎসর্গের শুভসূচনা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'শহীদ মরহুম মৃত্যুবরণ করে আমার জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে আমার জামাত একটি বড় দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী ছিল'।** পরে একই বিষয়ের উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, **'আমি খোদা তা'লার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ! কেননা এমন সদস্যও রয়েছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান এনেছেন, নিষ্ঠার সাথে এ পথ অবলম্বন করেছেন এবং এ পথে সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছেন'।**

কিন্তু যে দৃষ্টান্ত এ বীরপুরুষ অর্থাৎ সাহেবযাদা সাহেব স্থাপন করেছেন, আজও জামাতের (সংখ্যাগরিষ্ঠের) পক্ষ থেকে সে শক্তি প্রকাশ পাওয়া বাকী আছে। তিনি (আ.) বলেন, **'খোদা সকলকে সেই ঈমান ও দৃঢ়তা দান করুন, যার দৃষ্টান্ত এ শহীদ মরহুম রেখে গেছেন'।**

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্ত দোয়াকে, যা শেষ বাক্যে রয়েছে, গ্রহণ করেছেন এবং অনেককে সেই অবিচলতা দান করেছেন, যার কল্যাণে তারা যথাসময় জীবন উৎসর্গ করেছেন। পূর্ববর্তী শহীদদের ত্যাগের সেই ধারাবাহিকতা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছেন পাকিস্তানের আহমদীরা এবং তাদের মাঝে শত শত মানুষ এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক শহীদ স্ব স্ব ঈমানের উষ্ণতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। প্রত্যেক শহীদ ঈমানের প্রেরণা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। আহমদীয়াতের প্রত্যেক শহীদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাতে সজ্জিত হয়ে সে তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যাদের মাঝে ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং অন্যান্য দেশের শহীদরাও অন্তর্ভূক্ত আছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বিশেষ ভাবে সামনে এসে যান। ১৯৭৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দেয় তাতে ৩০/৩৫ জন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছিল, কিন্তু অনেককে উপর্যুপরি নির্যাতন করে হত্য করা হয়। পিতা-পুত্রকে শহীদ করা হয়েছে। পিতার সামনে পুত্রকে নির্যাতন করা হয়েছে। পুত্রের সামনে পিতাকে নির্যাতন করতে করতে বলা হয়েছে, আহমদীয়াত থেকে ফিরে আসবি কি না বল? আর এসব কিছু কেবল সাধারণ মানুষই করছিল না, বরং সেখানকার পুলিশও সামনে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। ইন্দোনেশিয়াতে প্রকাশ্যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে সন্ত্রাসের লক্ষ্য বানানো হয়েছে, পুলিশ ও রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে পালাক্রমে নির্যাতন করে আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে কিন্তু ঈমানের সুরক্ষাকারীগণ এবং অবিচলতার মূর্তীমান প্রতীকরা দেহের প্রতিটি স্থানে, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঘাত আসতে দিয়েছেন, কিন্তু স্বীয় ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি।

কাজেই পাকিস্তানের সংবিধান হোক বা ইন্দোনেশিয়ার অথবা অন্য যে কোন দেশের হোক, আহমদীদের প্রাণ হয়তো তারা কেড়ে নিতে পারবে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে না। শুনেছি, বর্তমানে মালয়েশিয়াও একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে উক্ত কাতারে যোগ দিচ্ছে বরং এসেই গেছে। তারা বর্তমানে একটি নুতন আইন করেছে, যা প্রকাশিত হচ্ছে। তারাও পরীক্ষা

করে দেখে নিক। স্মরণ রাখবেন! যখন খোদা তা'লার তক্‌দির স্বমহিমায় কাজ শুরু করবে, তখন হিসাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তখন কোন মোল্লা বা কোন সংবিধান তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে না, বরং এসব নামসর্বস্ব মোল্লা, যারা রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর নামকে কলঙ্কিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তাদেরকে সর্বপ্রথম অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন আহমদীদের ঈমান ও ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তা একান্ত মহিমার সাথে জ্বলজ্বল করবে।

তাই আহমদীদের এ বিষয় নিয়ে দুঃশ্চিন্তা নেই। তারা জানে, অবশেষে বিজয় তাদেরই। জাতিগতভাবে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, তারাও কুরবানী দিচ্ছে, কিন্তু এ সকল ত্যাগের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা। তাই আহমদীরা এই যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং আজও করে চলছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে; তা কোন উদ্দেশ্যবিহীন এবং সাধারণ মানের কুরবানী নয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার এবং বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকরা যতই বলুকনা কেন এটি নির্মম সত্য যে, সরকারী কর্মকর্তাগণ নিজেদের ছত্রছায়ায় আজও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ সকল কর্মকর্তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আজও আহমদীদেরকে অত্যাচার ও বর্বরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে চলেছে।

সম্প্রতি রাবওয়ার পুলিশ, যাদের মাঝে থানার ইনচার্জ বা ওসি এবং তার সহকারী আর সংবাদ অনুসারে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (ও এর সাথে জড়িত), আমাদের একজন অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ আহমদীকে কোন মামলা ছাড়াই এক মাসের মত থানায় আটকে রাখে। এরপর কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। যার ফলে এই নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী আহমদী, জনাব আব্দুল কুদ্দুস ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সকল নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে তথা পরপারে পাড়ি দেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ নিঃসন্দেহে তিনি শহীদের পদমর্যাদা লাভ করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ, রাবওয়ার নুসরাতাবাদ নিবাসী জনৈক আহমদ ইউসুফ যে আদালতের বাইরে স্টাম্প বিক্রি করতো, তাকে গত ৪/৫ অক্টোবরের দিবাগত রাতে অজ্ঞাত পরিচয় কেউ হত্যা করে। এরপর পুলিশ নিহতের ছেলের কথায় ও তার ইঙ্গিতে বিভিন্ন লোকদের বিভিন্ন সময় সন্দেহমূলকভাবে আটক করে তদন্তাধীন রাখে। পরে তাদের সবাইকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার বাদী, নিহতের ছেলের পক্ষ থেকে শহীদ মাষ্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের নামও নেয়া হয় আর পুলিশ তাঁকে থানায় ডেকে আটক করে। তিনি নুসরাতাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বাদী কোন কারণ ছাড়াই ডি.পি.ও-র কাছে লিখিত আবেদন করে মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। ১০ ফেব্রুয়ারী মাগরীবের নামাযের সময় পুলিশ মাস্টার সাহেবকে মসজিদে এসে গ্রেফতার করে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় নি। যোগাযোগ করলে পুলিশ বারবার একথাই বলে, আমরা জানি ইনিও নির্দোষ। বড় কর্মকর্তারা একথাই বলে যে, শীঘ্রই মামলা নিস্পত্তি হয়ে যাবে এখনো আমাদের কিছু অপারগতা রয়েছে, যে-কারণে তাকে গ্রেফতার করেছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ মার্চ ২০১২, মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে পুলিশ রাবওয়া থানা থেকে অজ্ঞাত কোন স্থানে স্থানান্তরিত করে । মাস্টার সাহেব কিছুই জানতেন না, তাকে কোথায় রাখা হয়েছে। তাকে নিরুদ্দেশ করার দশ দিন পর, অর্থাৎ ২৬ মার্চ পুলিশ তাকে থানায় ফিরিয়ে আনে এবং মাস্টার সাহেবের এক বন্ধুকে ফোন করে বলে, এসে তোমার লোক নিয়ে যাও। সে অনুযায়ী সেই বন্ধু সেখানে গেলে মাস্টার সাহেব তাকে বলেন, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। পুলিশ তখন সেই বন্ধুর কাছ থেকে সাদা কাগজে 'আমি তাকে ফেরত নিয়ে যাচ্ছি' মর্মে লিখিত নিয়ে মাস্টার সাহেবকে তার হাতে তুলে দেয়। মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই সেই বন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন জানা গেল, নিরুদ্দেশের প্রথম দু'তিন দিন পুলিশ মাস্টার সাহেবের উপর চরম দৈহিক-নির্যাতন চালায়, যার ফলে তার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। তার মলনালী থেকেও রক্ত বেরোতে থাকে, রক্ত বমি হয়, একইভাবে তার কিডনিও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। সাক্ষাতের সময় মাস্টার সাহেব বলেন, ১৭ মার্চ রাতের অন্ধকারে (তার জ্ঞান ছিল, কিন্তু আভ্যন্তরিণভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিলেন) কিছু পুলিশ তাকে রাবওয়া থানা থেকে এমন স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে ড্রাইভ করে যেতে ৫/৬ ঘন্টা সময় লাগে। কাঁচা রাস্তা বিধায় দূরত্ব কম হলেও সময় বেশী লাগে। একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়, যা ছিল একেবারে নির্জন আর সেখানে চরম নির্যাতন চালায়। পুলিশরা মারতে মারতে বলতো, এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত হিসেবে (জামাতের) কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নাম বল। তুমিও কর্মকর্তা, নাম বলে দাও, আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব, আর তাকে গ্রেফতার করবো, একই সাথে তারা একটি কাগজে স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করতে থাকে। এই কর্মকর্তাদের মাঝে কয়েকজন নাযেরের নামও তারা উল্লেখ করে এবং অন্যদেরও নাম নেয়। সেই কাগজে মাস্টার সাহেব সাক্ষর করেন নি। প্রহার ও নির্যাতনের সময় পুলিশ বলছিল, এই প্রথম আমরা জামাতী কোন কর্মকর্তাকে হাতে পেয়েছি। পূর্বে এরা হাত থেকে বেরিয়ে যেতো, (এসব বলে) আবার নির্যাতন করা শুরু করে দিত। নির্যাতন করার সময় কর্মকর্তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের নাম নিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে। নির্যাতনের কারণে মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে, রক্ত বমি করতে শুরু করেন, যার উল্লেখ পূর্বে করেছি। এ কারণে পুলিশ নির্যাতন বন্ধ করে এবং কিছু ঔষধ পত্র দেয়, অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে পুলিশ তাকে থানায় ফিরিয়ে আনে এবং তাকে তার বন্ধুর হাতে তুলে দেয়। মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে ফযলে-উমর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর সেখানে আই.সি.ইউ বিভাগে রাখা হয়। ক্রমাগতভাবে রক্ত দেয়া হয়। দু'একদিন পর রক্তবমন বন্ধ হয় ঠিকই কিন্তু শাহাদতের একদিন পূর্বে ২৯ মার্চ পুনরায় রক্ত বমি করতে শুরু করেন। যারফলে তার অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যার কারণে ৩০ মার্চ তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন এবং এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনেও স্থানান্তর করা হয়েছিল। ডায়লাসিস করার কথা ভাবা হচ্ছিল আর প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু পুলিশী-নির্যাতনের কারণে তিনি যে আভ্যন্তরীণ আঘাত পেয়েছিলেন তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, আর এভাবে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ

করেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা তার ভায়রা ভাই লিখেছেন।

তিনি মাস্টার সাহেবের সাথে হাসপাতালে (দেখাশোনার জন্য) ছিলেন। মাস্টার সাহেব বলেছেন, ১৭ মার্চ পুলিশ তাকে রাবওয়া ও চিনিউট থেকে কিছু দূরে "ঝাঙ্গাড় গ-ুতারাঁ" নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালায়। (ইনি বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে এসব কথা বলছি, কেননা মাষ্টার সাহেব স্বয়ং আমাকে এসব কথা বলেছেন) থানা থেকে হেঁটে তিনি আমজাদ বাজওয়াহ সাহেবের সাথে বাইরে আসেন। এরপর আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পথিমধ্যে মাস্টার সাহেব বলেন, এরা আমার উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ভয়ঙ্কর নির্যাতন করেছে। তিনি বলেন, থানার দারোগা এবং তদন্ত কর্মকর্তাও নির্যাতনে অংশ গ্রহণ করেছে। চিনিউট থেকে পিন্ডি ভাটিয়া রোডে নিয়ে যায়। এরপর "হার সে শেখ" হয়ে নদীর দিকে নিয়ে গেছে। নদীর মধ্য দিয়ে কোনো পথে আমাকে "ঝাঙ্গার গুলতারাঁ" নিয়ে যায়। সেখানে স্থানীয় চেকপোস্টে আমাকে বন্দী করে রাখে। কিছুক্ষণ পর আমাকে হাজত থেকে বের করা হয়। বের হয়ে দেখি, রাবওয়া থানার দারোগা, তদন্ত-কর্মকর্তা, স্থানীয় দারোগা এবং ডি.এস.পি. চেয়ারে বৃত্তাকারে বসে আছে। তাদের হাতে একটা কাগজ ছিলো। তারা বললো, এ হলো তোমার জবানবন্দী, এতে দস্তখত করে দাও। এতে সদর আঞ্জুমানের কর্মকর্তা ও সদর উমুমীর বিরুদ্ধে জবানবন্দী লেখা ছিলো। (রাবওয়ায় যে) হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, তাতে এরা জড়িত এবং তারা এ কাজ করিয়েছে। আমি বললাম এতো মিথ্যা, আমি কেন এতে দস্তখত করবো। তারা বললো, তুমি দস্তখত করলে আমরা তোমায় ছেড়ে দিব। তিনি বলেন, আমি দস্তখত করতে অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, এ আমার জবানবন্দী নয় আর এমনটি ঘটেও নি তাই আমি কীভাবে দস্তখত করতে পারি? তারা আমাকে হুমকী দেয়, স্বেচ্ছায় দস্তখত দিলে বেঁচে যাবে, নতুবা আমরা এ-কথা তোমাকে দিয়ে বলিয়েই ছাড়বো। মাস্টার সাহেব বলেন, আমি দু'বার অস্বীকার করার পর সাথে দাঁড়ানো অসুরের মতো দু'জন মানুষ আমাকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করে, ক্রমাগত মারতে থাকে এবং তারা দস্তখতের দাবী পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বিভিন্ন পন্থায় নির্যাতন চালানো হয়। (নির্যাতনের বিবরণ দিতে গিয়ে) তিনি কিছু শব্দ লিখেছেন। রশি দিয়ে বেঁধে শাস্তি দেয়া, রড দ্বারা অত্যাচার করা, রোলার চালনা, প্রভৃতি নির্যাতনের বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। শুইয়ে দেহের উপর কাঠের রোলার চালানো হয়। এটি খুব বড় আকৃতির ও খুব ভারী হয়ে থাকে, যা দেহের উপর চালানো হয়। অনুরূপভাবে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। রশি দিয়ে বেঁধে মাটিতে হেঁচড়ানো হয়। এছাড়া ক্রমাগত জাগিয়ে রাখে। ঘুমে চোখ বন্ধ হবার উপক্রম হলেই আমাকে ঘরের বাইরে বের করে মারতে শুরু করতো। সেখানে এক কুখ্যাত ডাকাতও ছিল। সেও সাথে ছিল। পুলিশদের কাছে চামড়ার তৈরী এক প্রকার চাবুক থাকে। মারধর করার জন্য তা ব্যবহার করে। ডাকাতকে পাঁচ বার মারলে আমাকে মারত পঁচিশ বার। একবার শরীর বেশি খারাপ হলে নিকটবর্তী হারসা শেখ গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে বিভিন্ন ইঞ্জেকশন ও ঔষুধ দেয়। শরীর ঠিক হতেই আবার নির্যাতন শুরু করে। থানার দারোগা এবং অন্যরাও এদের সাথে যোগ দিয়েছিল। অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বলতো, এখন তোমাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য লন্ডন ও রাবওয়া থেকে তোমার নেতাদেরকে ডাক, আর এরপর জামাতের সম্মানিত লোকদের গালি দিত। তিনি আমাকে বলেন, গালি শুনে বড়ই মর্ম যাতনা পেতাম। আঘাত সহ্য হচ্ছিল কিন্তু গালি শোনা অসহ্য ছিল। খাবারও যৎসামান্য দিত। তিনি বলেন, এমন অত্যাচার-নিপীড়ন আমি কখনো দেখিও নি, শুনিও নি। আমার মধ্যে এগুলো সহ্য করার মতো এত শক্তি ছিল না। আমি দোয়া করছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিপীড়ন সহ্য করার শক্তি দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় করুণায় আমাকে এগুলো সহ্য করার শক্তি দিলেন। সদর উমুমী সাহেব আমাকে (হুযুরকে) লিখেছেন, আমি তাকে বললাম, তারা আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছে, নিশ্চয় কিছু লিখিয়ে নিয়ে থাকবে। তিনি খুব আবেগঘন ভাষায় তাকে বলেন, তারা আমার নিকট থেকে একটি অক্ষরও লিখাতে পারেনি।

অতএব এ হচ্ছে ঈমান সুরক্ষাকারী এবং সত্যে অবিচল মানুষের কাহিনী। মূর্তিমান এক সংকল্প ও প্রত্যয়ের প্রতিচ্ছবি! প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকেও শির্কের সমতুল্য অভিহিত করেছেন। কাজেই এ মহান শহীদ আমাদেরকে অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি এ শিক্ষাও দিয়ে গেছেন যে, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা কল্পে জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করবে না, যা আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেননা মিথ্যাও শির্কের সমতুল্য এবং আমরা কোনভাবেই শির্কে লিপ্ত হতে পারি না। মরহুম শহীদ তাঁর বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। শহীদ মরহুম যদি নির্যাতনের মুখে পুলিশের দুরভিসন্ধি অনুসারে বিবৃতি দিতেন, যেমনটি তারা চেয়েছিলো, তবে জামাতের জন্য এর পরিণতি সামগ্রীকভাবে খুবই ভয়াবহ হতে পারত; যেমনটি কিনা শহীদ মির্যা গোলাম কাদেরকে তারা নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার হাতিয়ার বানাতে চেয়েছিল। সেটি ছিলো একটি নাম সর্বস্ব সংগঠন বা সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু এখানে স্বয়ং পুলিশ তা করতে চেয়েছে। অবশ্য জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং নির্দোষ হবার দাবী করছে। বলছে যে, তাদেরকে বাইপাস করে অধস্তন অফিসারদের মাধ্যমে সরকারের উঁচু মহল থেকে কোন নির্দেশ এসেছে, যা মানা হয়েছে; এটিও অসম্ভব নয়। প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা কখনো কখনো নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জেনারেল জিয়াউল হকের যুগে জিয়া স্বয়ং থানার দারোগাকে ফোন করতো, এক্ষেত্রেও তেমনটি হতে পারে। কারণ প্রাদেশিক সরকারও আমাদের বিরোধী। এখন যখন পুলিশের এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা চলছে, তখন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি মিটমাট করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে যে মিমাংসা করে নাও। পাকিস্তানে অপরাধীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, বাহ্যতঃ ন্যায় বিচারের আশা নেই। কিন্তু আইনের ভেতর থেকে জামাত সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং ইনশাআল্লাহ্ করবে। যাহোক, পুলিশের মনগড়া কোন কাগজে যদি তিনি স্বাক্ষর করতেন তবে এটি ভয়ানক হতে পারত। হত্যার মিথ্যা মামলায় কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় দপ্তর সমূহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ হতে পারতো। শান্তিপ্রিয় জামাত হিসেবে আমাদের যে শিক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা রয়েছে, এর দুর্ণাম হতে পারতো। আরও অনেক এমন বিষয় হতে পারতো, যারফলে জামাতের ক্ষতির আশংকা ছিল। শুধু দেশীয় পর্যায়েই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও

হতো। মোটকথা, তারা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমন এক নিষ্ঠাবানের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন, যিনি ব্যক্তি-জীবনে খুবই কোমল-হৃদয়ের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, যিনি এমন কঠোরতা সম্পর্কে ধারণাও রাখতেন না। কিন্তু তিনি তাদের মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দৃঢ়-পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়েছেন। জামাতের উপর কোন ধরনের আঁচ আসতে দেননি।

অতএব হে কুদ্দুস! তোমায় সালাম জানাই। তুমি নিজেকে অবর্ণনীয়-কষ্টে নিপতিত করেছ, কিন্তু জামাতের সম্মানে আঁচ/আঘাত আসতে দাওনি। তুমি নিজের প্রাণ দিয়ে জামাতকে এক ভয়ানক পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছ। অতএব মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব একজন সাধারণ শহীদ নন, বরং শহীদদের মাঝেও তাঁর মর্যাদা অনেক বড়। এই ক্ষণস্থায়ী জগত ছেড়ে একদিন সবাইকে যেতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান মাস্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, যাঁকে খোদা তা'লা জীবিত আখ্যায়িত করেছেন। আর তিনি এমন জীবিকার ভাগী হয়েছেন, যা জাগতিক রিয্ক থেকে অনেক মহান ও উন্নত মানের। যে জামাত ও যে উদ্দেশ্যে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এর প্রকৃত পুরস্কার তিনি ঐ জগতে গিয়ে অবশ্যই পাবেন। মরহুম শহীদ আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অর্থাৎ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (সূরা আলে ইমরান: ১৭৪) আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহক।

অতএব এ শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন যে, অবস্থা যেমনই হোক না, কেনো অবস্থাতেই আল্লাহ্র আঁচলকে ত্যাগ করা যাবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও একইভাবে বলেছেন, **'জগদ্বাসী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে'।** আহমদীদেরকে গালি দিয়ে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে নোংরা ভাষা ব্যবহার করে আমাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে যাতনা ও কষ্ট দিয়ে আনন্দিত হতে পারো। কিন্তু সেদিন সমাগত যখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে হিসাব নিবেন। মরহুম শহীদ মোটের উপর পাকিস্তানের সকল আহমদীদের আর বিশেষভাবে রাবওয়ার আহমদীদেরকে এ বার্তা দিয়ে গেছেন যে, আইন ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যকীয় কিন্তু কোন মানুষ, সে যত বড় পুলিশের কর্মকর্তা বা অফিসারই হোক না কেন, ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। তারা যত নির্যাতনই আমাদের উপর চালাক না কেনো একজন আহমদীকে ভয় করতে হলে শুধুমাত্র এক সত্তাকেই ভয় করা উচিত আর সে সত্তা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। পুলিশ কর্মকর্তাদের শক্তি কেবলমাত্র আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের ক্ষেত্রেই চলে। সন্ত্রাসীদের সামনে, মোল্লাদের সামনে, যারা ভাঙ্গচুর ও উগ্রতাপ্রিয়, যারা তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ায়, যারা তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়, এদের সামনে ভয়ে তাদের বাকশক্তি হারিয়ে যায়। বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন পেশায় জড়িত অ-আহমদী বন্ধুদের সাথে একটি সভা হচ্ছিল, তাতে একজন আমাকে বলতে লাগলেন, আপনার জামাতের একটা বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেকেই বয়আতের অঙ্গীকার করেছে। আর আপনি যা তাদেরকে বলেন, তারা তা মানে আর মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আপনারা কার্যতঃ কোন প্রদক্ষেপ কেন গ্রহণ করেন না? আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হতে পারি না। যেহেতু আইন আহমদীদেরকে বলে-রাজনীতিতে আসার পূর্বে প্রথমে মেনে নাও যে, তোমরা অমুসলিম, কেবল তাহলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারবে ভোটাধিকারও এর অন্তর্ভূক্ত। আর এটি আমরা কখনো করবো না, করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় পেশী শক্তি প্রদর্শন, উগ্রতা আর সন্ত্রাসও আমরা করতে পারি না, কেননা, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা এ যুগের পথপ্রদর্শককে মান্য করে এটিই শিখেছি; যা সঠিক ইসলামী শিক্ষা, আর তা হতে আমরা বিচ্যুত হতে পারি না।

অতএব, সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গ দেয়, যারা চরমপন্থী বা তাদের ভয় করে যারা উগ্রপন্থী, যাদের হাতে রাজপথ আর যারা রাস্তায় নেমে আসে। এভাবে রাজনীতিবিদরাও তাদের কথা মানে। সে-কারণেই আহমদীদেরকে তাদের প্রাপ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বয়আত সম্পর্কে আমি বলেছি, বয়আতের কারণেই আহমদীগণ নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করে চলছে এবং কোন আইনই নিজের হাতে তুলে নেয় না। অবশ্য একদিন আসবে, যখন এসব লোকই আহমদীদের সম্মান করতে বাধ্য হবে। যদিও আজ আমাদেরকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা অন্যায় করেন না। হয়ত কিছুকাল তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। কাজেই কেবল খোদা তা'লার সামনেই অবনত হোন, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করুন, এবং তাঁর প্রাধান্য বিস্তারী নিয়তির অপেক্ষা করুন।

স্নেহের শহীদ কুদ্দুস সাহেব সম্পর্কে কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্য বলেছে যে, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু একইসাথে চাপও প্রয়োগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তাদের ন্যায়ের চোখ উম্মোচিত করুন। যদি এরূপ না হয়, তখন বলা হবে, যদিও সরকারী কর্মকর্তারা এই বর্বরতার জন্য দায়ী, আর তাদের মাঝেই এটি সীমাবদ্ধ, কিন্তু সরকার বা পুলিশের কর্মকর্তাদের এতে কোন হাত নেই; অর্থাৎ প্রতিবাদ আরম্ভ হবার পর তারা এমন কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি ন্যায় বিচার না করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রই এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমি যেভাবে বলেছি, খোদার পক্ষ থেকে তকদীর প্রকাশে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু প্রকাশ পাবে না এটি অসম্ভব। এসব লোক অবশ্যই বিভীষিকাময় (শিক্ষণীয়) পরিণতির শিকার হবে। জামাতের ক্ষতি সাধনে তাদের যে হীন চেষ্টা ও বাসনা তা কখনো সফল হবে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামাত উন্নতি করতে থাকবে। এসব জীবন-উৎসর্গকারীর কুরবানীর ফলেই আহমদীয়া জামাত পৃথিবীর দু'শতটি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। অতএব প্রত্যেক কুরবানীর ফলশ্রুতিস্বরূপ আহমদীদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়া উচিত যে, এটি আমাদের বিজয়ের দিন ও ক্ষণকে আরো নিকটতর করছে। ত্যাগ যত বড় হবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা তত দ্রুত বর্ষিত হবার আশা করা যায়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা স্বরণ করুন। তিনি কুরআন করীমে বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৪০) অর্থাৎ তোমরা দুর্বলতা প্রর্দশন করো না আর দুঃচিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। যদি মু'মিন হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। কাজেই নিজেদের ঈমানের সুরক্ষা করা আমাদের জন্য

আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক কুরবানী, প্রতিটি শাহাদত, আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হওয়া উচিত। তাহলে দেখবে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয়, ইনশাআল্লাহ্। ধৈর্য, সাহসিকতা ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাও। কতিপয় লোক আমাকে লিখেন, দোয়া ও ধৈর্য ছাড়াও আমাদের কিছু করা উচিত। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এবং সর্বদা বলে থাকি, ধৈর্য ও দোয়াই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। প্রত্যেক আহমদী যদি এর সঠিক ব্যবহার করে, তাহলে দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা কত দ্রুত অবতীর্ণ হয়। এখনো আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়ার তুলনায় বহুগুণ বেশী ফল প্রদান করছেন। অতএব আমাদের দুঃখিত ও দুঃচিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। যদিও শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাহ্যতঃ ভয়ঙ্কর মনে হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন,'ওয়া লা তাহ্‌যান' অর্থাৎ তোমরা দুঃখিত হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র উবে যাবে। জামাতকে ধ্বংস করা সম্পর্কে শত্রুর সকল দুরভিসন্ধি কখনো সফল হবে না। হাঁ, ঐ লোকদের দল দিন দিন ছোট হতে থাকবে, হচ্ছে। তাদের মধ্য থেকেই পবিত্র স্বভাবের লোকেরা জামাতে আহমদীয়ায় প্রবেশ করতে থাকবে।

অতএব প্রতিটি ত্যাগের ঘটনা আমাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করে এবং করা উচিত, যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতাকে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পরিবর্তন করার জন্য এই কুরবানীর মাধ্যমে আর এক ধাপ আমাদেরকে অগ্রগামী করেছেন। প্রত্যেক কুরবানীর ফলে এমন হয়, কিন্তু শহীদ কুদ্দুসের ত্যাগের মত কুরবানী জামাতকে শত শত ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয় এবং হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের প্রতিক্রিয়া নৈরাশ্যও নয় আর উগ্রতাও নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, বরং আমরা তা পূর্ণ হতে দেখছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং তাঁর জামাতকে ধৈর্য ও দোয়ার সাথে কাজ করে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এরপর সফলতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

কাজেই, কে আছে যে, আমাদের এই ভাগ্য কেড়ে নিতে পারে, যার সিদ্ধান্ত স্বয়ং খোদা তা'লা করে রেখেছেন? আমাদের দোয়া করা উচিত, কোথাও আমাদের জন্য অবধারিত বিজয়কে আমাদের অধৈর্য ও আমাদের ঈমানের দুর্বলতা দূরে ঠেলে না দেয়। এটিও স্মরণ রাখবেন! আহমদীয়া জামাত দেশ (পাকিস্তান) গড়া ও দেশের উন্নতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছে এবং ত্যাগ স্বীকার করেছে। আজও আহমদীদের দোয়াই দেশকে রক্ষা করছে এবং করতে পারে। আমরা দেশের জন্য প্রদত্ত আমাদের অগ্রজদের ত্যাগকে আমাদের দুঃখ-কষ্ট এবং শাহাদতের কারণে বিনষ্ট হতে দেবো না, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব এসব অত্যাচারের অবসান কেবল একভাবেই হতে পারে, আর এই দেশকে বাঁচানোর একটিই উপায়, তাহলো, পূর্বের চেয়ে অধিক খোদা তা'লার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে কল্যাণ ভিক্ষা চাওয়া। নির্যাতিত হবার পাশাপাশি যদি আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক তাক্বওয়া, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, দোয়া এবং ইস্তেগফারের উপর প্রতিষ্ঠিত হই, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের দৃশ্য অতিসত্বর দেখতে সক্ষম হবো। আমরা পাকিস্তান এবং অন্যান্য ইসলামী দেশগুলো থেকে ধর্মের নামে নির্যাতন এবং প্রত্যেক ধরনের অন্যায়ের অচিরেই অবসান দেখবো, খোদার কাছে আমি এ দোয়াই করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'প্রত্যাদিষ্ট এবং তাঁর জামাতের উপর ভূমিকম্প এসে থাকে, ধ্বংসের আশংকা দেখা দেয়, বিভিন্ন প্রকার বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। 'কুযযেবূ'র এটিই অর্থ। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনার আর একটি উপকারিতা হলো, দুর্বল এবং দৃঢ়দের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। কেননা যারা দুর্বল, তারা শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে চেয়ে থাকে, বিপদ আসলে তারা পৃথক হয়ে যায়। আমার সাথে এটিই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত, যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ পায় না। বান্দার সাথে খোদা তা'লার গভীর ভালবাসার প্রমাণ হলো, তিনি তাদের পরীক্ষা নেন। যেভাবে তিনি (আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে) বলেন,**

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(সূরা আল্ বাকারাঃ ১৫৬-১৫৭) অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের সমস্যা এবং দুঃখে তার প্রত্যাবর্তন খোদা তা'লার দিকেই হয় এবং খোদা তা'লার পুরস্কার তারা-ই পায় যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করে। আনন্দময় সময় যদিও দেখতে সুমিষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু পরিণামে কিছুই হয় না। বিলাসিতার মধ্যে থাকলে অবশেষে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। খোদা তা'লার ভালবাসার প্রমাণ হলো, তিনি পরীক্ষায় ফেলেন এবং এর মাধ্যমে নিজের বান্দার মর্যাদাকে প্রকাশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, কিসরা (ইরানের সম্রাট) যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে গ্রেফতারের নির্দেশ না দিতো, তাহলে তার সেই রাতে মারা যাবার নিদর্শন কীভাবে প্রকাশ পেতো? আর যদি মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.)-কে দেশান্তরিত না করতো, তাহলে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا 'র ধ্বনি কীভাবে শোনা সম্ভব হতো।' প্রত্যেকটি নিদর্শন পরীক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঔদাসীন্য ও বিলাসী জীবনের সাথে খোদা তা'লার কোন সম্পর্ক নেই। যদি সফলতার পর কেবল সফলতাই আসে, তাহলে আকুতিমিনতি এবং কান্নাকাটির সম্পর্ক একেবারেই থাকে না, অথচ খোদা তা'লা এটিকেই পছন্দ করেন। তাই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যক'।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার ঈমানে উন্নতি দিন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখুন। আর আমাদেরকে বিজয় এবং সাহায্যের দিন অচিরেই দেখান। এ কুরবানী সমূহ গ্রহণ করুন আর শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি শহীদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। তার সংক্ষিপ্ত জীবনিও তুলে ধরছি।

তার পিতার নাম মিয়া মুবারক আহমদ সাহেব। তিনি শিয়ালকোটের অধিবাসী। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার বড় দাদা মুকাররম মিয়া আহমদ ইয়ার সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি গুজরাঁনওয়ালার ফিরোজওয়ালার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন আর সাহাবীও ছিলেন। একইভাবে তার বড় দাদী শ্রদ্ধেয়া মেহতাব বিবি সাহেবা (রা.)-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীয়া (মহিলা সাহাবী) ছিলেন। মাষ্টার শহীদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব ১৯৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন।

শাহাদতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর।

তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন এরপর পিটিসি-র কোর্স করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজত হন। শহীদ মাষ্টার সাহেবের বিয়ে গুজরাঁনওয়ালার আমীর পার্ক জনাব মাষ্টার বাশারাত আহমদ সাহেবের কন্যা রুবিনা কুদ্দুস সাহেবার সাথে ১৯৯৭ সালে হয়। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, তিনি স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। আনুমানিক ২০ বছর ধরে এ কাজ করেছেন। সরকারি স্কুল-শিক্ষক হিসেবে রাবওয়াতেই শিক্ষকতা করতেন। তার সহকর্মী এবং শিক্ষকদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন।

নুসরাতাবাদ মহল্লায় বসতি স্থাপনের আগে পূর্ব-দারুর রহমতে বসবাস করতেন। দারুর রহমতে অবস্থান কালে তিনি আতফালুল আহমদীয়ার যুগে মজলিসের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকাল থেকেই তিনি জামাতের কাজ করে আসছেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মুন্তাযিম আতফাল এবং পরে ১০ বছর পর্যন্ত হালকা যয়ীমের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ১৯৯৪ সালে নুসরাতাবাদে স্থানান্তরিত হন। এখানেও দ্রুত জামাতের কাজে যুক্ত হন। নুসরাতাবাদ মহল্লার হালকা যয়ীম এবং মজলিস সেহত এর তত্ত্বাবধানে নৌকাবাইচ বিভাগের ইনচার্জ। কুস্তি এবং সাঁতারে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। এবং সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আড়াই বছর পূর্বে পাড়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে খুবই উত্তমভাবে তিনি সেবা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। মহল্লাবাসীদের মতে শহীদ মরহুম অত্যন্ত সদাচারী এবং বড় মনের মানুষ ছিলেন। কেউ কঠোর ভাষায় কিছু বললেও তিনি হাসিমুখে তা সহ্য করতেন। কর্মকর্তাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত আর এমন গুণাবলীই প্রত্যেক পদাধিকারীর হওয়া উচিত। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিরাপত্তা বিভাগেও তিনি দীর্ঘসময় ধরে সেবার সুযোগ পেয়েছেন। ২০০২ সাল থেকে শাহাদত পর্যন্ত কেন্দ্রের সিকিউরিটি বিভাগের অধীনে উলুম 'বে'র ইনচার্জ ছিলেন। ডিউটিরত খোদ্দাম ও কর্মীদের সাথে খুবই বিনয়াবনত ব্যবহার করতেন। দীর্ঘসময় ডিউটিতে থাকার কারণে স্বয়ং গিয়ে তাদের খাদ্য-পানিয়ের ব্যবস্থা করতেন, চা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। খোদ্দামরা তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলো।

শহীদ মাষ্টার আব্দুল কুদ্দুস সাহেব অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। সৃষ্টির সেবা করার একটি উম্মাদনা ছিল তাঁর মাঝে। চেনাব নদীতে কেউ ডুবে গেলে আহমদী বা অ-আহমদীর পার্থক্য না করে সঙ্গীদের নিয়ে দিন-রাত লাশ সন্ধানের কাজে লেগে থাকতেন। লাশ খুঁজে বের করা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন না। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। শহীদ মরহুম আনুগত্যের ক্ষেত্রে এক আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন এবং জামাতের কর্মকর্তাদের সম্মানের প্রতি তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। ছাত্র জীবন থেকেই খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তিনি অংশ নিতেন।

কাবাডি, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, ইত্যাদি এবং নৌকাবাইচের ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। আমার সাথেও তিনি ডিউটি দিয়েছেন। ডিউটি দেয়ার সময় আমি দেখেছি, তিনি কখনো সামনে এসে ডিউটি করার মতো অতি উৎসাহ প্রদর্শন করতেন না। কোন নাম কামানো বা লোক দেখানোর অভ্যাস ছিলো না। অনেকের সর্বদা সামনে থাকার অভ্যাস হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি ইনচার্জ হওয়া সত্ত্বেও পিছনে থাকতেন। নিজের অধিনস্তদের সামনে রাখতেন। তার মায়ের ইচ্ছা ছিল, তাকে জামেয়ায় পাঠানোর কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি। মরহুমের স্ত্রী বলেন, শহীদ খুবই মিশুক, স্নেহপ্রবণ, কৃতজ্ঞ, সহমর্মী এবং দোয়াকারী মানুষ ছিলেন। আমাদের সবার প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন আর আমাদের সাথে কখনো কঠোর ব্যবহার করেন নি। দুঃখ-কষ্ট যাই হোক না কেন, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে তাদের পাশে থাকতেন। শাহাদতের একদিন পুর্বে বাচ্চাদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার উপদেশ দেন। তার সন্তানদের মাঝে এটি বিদ্যমান থাকবে, আমি সে দোয়াই করি। তার স্ত্রী আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন, আমার স্বামী প্রায় সময় আমাকে বলতেন, "পরে তুমি স্মরণ করবে"। অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে কিছু বলার পর এমন কথা বলতেন। শেষ সময় এই উপদেশই দিয়েছেন যে, আমার মায়ের দেখাশুনা করবে, বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখবে। তাঁর কথা তাঁর (স্ত্রীর) মনে পড়বেই। কিন্তু কদ্দুস শহীদের সাথে আমাদের এবং রাবওয়াবাসীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। সত্যিকার অর্থে তিনি জামাতের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন, আর অনুগ্রহকারীকে জামাত কখনো ভুলে না। তার কথা সর্বদা আমাদেরও স্মরণ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

ফোনে তার মায়ের সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনি বেশ বয়স্কা, কিন্তু দৃঢ়-সংকল্পের অধিকারীনি, বাচ্চাদের সাথেও কথা হয়েছে। সন্তান-সন্ততিরাও (মাশাল্লাহ্), নিজেদের কষ্টকে ভুলে আমার খবরা-খবর নিচ্ছিলো। একইভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথেও কথা হয়েছে। তিনিও পরম ধৈর্যশীলা ও খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন এবং নিজেই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সাহায্যকারী হোন ।

পিতামাতা বয়োবৃদ্ধ; তার পিতা এখানে হল্যান্ডে থাকেন কিন্তু মা ওখানে তাদের সাথেই থাকতেন, অর্থাৎ কুদ্দুস সাহেবের সাথে। স্ত্রী ছাড়াও তিনি ১৪ বছরের এক ছেলে আব্দুস সালাম, যে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তের বছর বয়স্ক আব্দুল বাসেত, যে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, পাঁচ বছরের আব্দুল ওয়াহাব, যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র এবং দশ বছর বয়স্কা এক মেয়ে, আতিয়াতুল কুদ্দুসকে রেখে গেছেন, যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের হাফেয ও নাসের হোন। এখন জুমুআর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো, ইনশাল্লাহ্ তা'লা।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি

নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

ভূ-পৃষ্ঠে আল জান্নাতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর শুভাগমনে। ধরাপৃষ্ঠে মহানবী (সা:)-এর আগমনকে রূপকভাবে মহান আল্লাহতালার আবির্ভাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি (সা:) **রূহ-উল-আমিন** এর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছেন। নিরাপত্তা লাভের এ এক এমনি মহান স্তর, যা মানুষের কল্পনাতীত এক অবস্থান, যেখানে মহান স্রষ্টার সাথে বান্দার পরম ও চরম নৈকট্য প্রাপ্তি ঘটে। এটি তৌহীদি সত্তার সাথে বান্দার এমন এক নিবিড় সম্পর্ক যাকে পবিত্র কালাম কুরআন করীমে **দানা-ফা-তা-দাল্লাহ-ফাকানা ক্বাবা ক্বাওসাইনে আও আদনা** (৫৩ : ৯-১০) অর্থাৎ সে (আল্লাহ্‌র) নিকবর্তী হলো, তখন তিনিও (আল্লাহ্) নিচে নেমে এলেন এরপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা এর চেয়েও নিকবর্তী বলে নিরূপন করা হয়েছে। এ আয়াত সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করছে যে মহানবী (সা.) এর মাঝে মহান আল্লাহতালার ঐশী গুনাবলীর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি (সা.) **"আল-আবদ্"** (৭২:২০)-ও ছিলেন। পবিত্র কুরআন তাঁকে **"আব্দুল্লাহ"** আল্লাহ্‌র বান্দা খেতাবেও ভূষিত করেছে। যার ফলে তিনি মানব জাতির জন্য সর্বকালে অনুকরণীয় সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছেন।

আখেরী জামানায় মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি অশেষ করুণা করে তার (সা.) এক অনুগত দাস গোলাম আহমদ-কে প্রেরণ করেছেন। প্রেরীত এই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে সম্বোধন করে এক ইলহামে আল্লাহ তাআলা বলেছেন **"ইন্নি আনযালতু মা আকা আল জান্না"** অর্থাৎ "তোমাকে প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে আমি জান্নাতের অবতরণ ঘটালাম"।

যদিও মানব জাতির মাঝে আল্লাহ তাআলার মহান রসূলের অবস্থান জগতকে জান্নাতেরই রূপ দান করে তবে এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধীত এই ইলহামে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাআলা এমন এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনা জারী করবেন যা মানব জাতীকে বংশ পরম্পরায় জান্নাতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর এর ফলে আল্লাহ তাআলার পবিত্র সন্নিধ্য প্রাপ্তির কারণে তারা প্রশান্তি লাভে পরিতৃপ্ত হতে থাকবে।

সেই বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনার দুটো উপাদান- **১. আল-ওসিয়্যত ও ২. খিলাফত।**

আল ওসিয়্যত সেই সমস্ত ব্যবহারিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যা মানবকে হেদায়াতের পথে বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ আর কুরবাণীর জন্য প্রতিনিয়ত অগ্রপানে ধাবিত করে চলে। আর পরিনামে তারা কল্যাণময় খিলাফতের পুরস্কারে অভিসিক্ত হয়। খিলাফত-একতা ও ভ্রাতৃত্ব , তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি আর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের অভিযাত্রায় কল্যাণমন্ডিত পাথেয়।

এভাবে আল-ওসিয়্যত ও খিলাফত পরস্পর নির্ভরশীল আর এদের যুগপৎ অবস্থান যৌথভাবে মানব জাতিকে 'আল-জান্নাত' এর নিরাপদ ও প্রশান্তিময় পুরস্কার দিয়ে জগতকে শান্তি ও সুস্থিতির রহমতপূর্ণ ছায়ায় ঢেকে রাখে।

আল-ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) ১৯০৫ ইসাব্দে জারী করেন আর ১৯০৮ ঈসাব্দে তাঁর পরকাল যাত্রার পর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খিলাফতের এই আশিষ জগত বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মুসলিম উম্মাহকে অধপতিত অবস্থা থেকে উন্নীত করে আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমুজ্জল এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটাতে আর্বিভূত হয়েছেন, যারা তাদের সংগ্রাম মুখর প্রচেষ্টায় ও কুরবানীতে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তাআলার এমনই আশিষ লাভ করেছেন যে, আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের এই পথের অভিযাত্রীরা ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়ে চলছেন।

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে প্রত্যাশী এই অভিযাত্রীরা **কাফূর** জৈবিক ইন্দ্রিয়াশক্তির উগ্রতা হ্রাসকারী কর্পুর মিশ্রিত শরবত (৭৬:৬) **তাফজীর** আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা ও ঐশী উপলব্ধির প্রস্রবন ধারার পানীয় (৭৬:৭) **যানজাবীল** আত্মাকে ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে উদ্দীপ্তকারী আদা মিশ্রিত শরবত (৭৬:১৮) ও **সালসাবীল** আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সরল ও সংক্ষিপ্ত পথ অন্বেষণ পিপাসা নিবারণের (৭৬:১৯) শুধা পান করে আধ্যাত্মিক উর্ধাগমনের অনন্ত পথে ক্রমান্বয়ে লাভ করায় এগিয়ে চলছেন। এমনকি তারা **রূহুল কুদুস**-এর অভয়বাণী **ফীহে-মীন-রূহেনা** (৬৬:১৩) মরিয়ম সদৃশ সাধু মু'মিনের অন্তরে রূহ ফুঁকে দেওয়ায় মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.) এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে **ওয়াস্ সাবিকুনাস্ সাবিকুন** (৫৬:১১) একটি দল হবে সবার চেয়ে অগ্রগামী, যারা সবাইকে অতিক্রম করে **উলায়েকাল মুক্কাররাবুন**- তারা আল্লাহ্‌রই নৈকট্য প্রাপ্ত হবেন আর এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করায় তাদেরকে সম্বোধিত করা হবে **'ইয়া আই ইয়াতুহান্ নাফসুন মুতমাইন্নাত'** (৮৯:২৮) হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বলে।

পবিত্র কুরআনে সেইসব মুমিনদেরকে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যারা সুদৃঢ় ইমানের অধিকারী এবং সৎকর্মশীল (২৪:৫৬)। এর থেকে প্রতীয়মান হয় মুমিনদের মধ্যেকার সেই তাকওয়া পরায়ণ অংশ যারা সৎকর্মশীল আর বিশ্বাসের উন্নততম মানের অধিকারী, খিলাফতের আশিষে অনুগৃহীত হবে তারাই, যাদের কল্যাণে ও সেবায় অবশিষ্ট মানবজাতি উপকৃত হবে এবং মুমেনদের অন্তর্বলয়ে অবস্থানকারী তাকওয়াপরায়ণ এই

সৎকর্মশীল স্বল্প সংখ্যক মুমেনরাই খেলাফতের ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করবে।

আল ওসিয়্যতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এমনই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। মসীহ মাওউদ (আ:) এই আকাংখা ব্যক্ত করেছেন যে, তাকওয়াপরায়ণ সেই মুমিন লোকগুলির জামাত যাদেরকে **"কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন"** (৩:১১১) অর্থাৎ আহমদীদের অধিকাংশই হলেন তারা, মানব জাতির কল্যাণার্থে উত্তম যে লোকগুলোর উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। অতএব, আহমদীগণ তাদের কুরবাণীতে, তাদের সততা ও বিশ্বস্ততায় অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠার অন্যান্য লোকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হবেন।

পবিত্র কুরআন আল ওসিয়্যতের এই ব্যবস্থাপনাটিকে পরিস্কার এ ভাষায় তুলে ধরেছে " জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন" (৯:১১১)। এই আয়াতের নির্দেশনাটিকে পবিত্র কুরআনেরই অপর একটি সূরার অন্য এক আয়াতে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পূণ্য অর্জন করতে পারবেনা। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ নিশ্চয় সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত (৩:৯৩)। এই আয়াতে আমলে সালেহার মর্যাদা তুলে ধরতে **'আল-বিররা'** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উৎকৃষ্টতায় আর সঠিকতার এক উচ্চমান নির্দেশ করে অর্থাৎ তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মান মর্যাদা আর পরিমাপের দিক থেকেও আমাদের প্রচেষ্টা ও কুরবানীকে এক সুউচ্চ মিনারে উন্নীত করায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে অর্থাৎ এমন কিছু যা আমরা সবচেয়ে ভালবাসি, আল্লাহ্‌ তাআলাকে লাভ করার জন্য আমাদেরকে তা অবশ্যই কুরবাণী করতে হবে। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা একজন মানুষের আমলে সালেহার প্রতি অঙ্গীকার পূরণে আর কুরবাণীর ক্ষেত্রে তার গুনগত অবস্থান তুলে ধরে। আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হলো সেই ব্যবস্থাপনা যার হিসাব নিকাশের মাধ্যমে পুরস্কারের মান নিরূপিত হবে যেমনটি পবিত্র কুরআনে **"আল-শাকিরিন"** (৩:১৪৫)-এ বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন করীমে আরও বলা হয়েছে **"ওয়া ইযাল জান্নাতু উযলেফাত"** জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে (৮১:১৪) অর্থাৎ যেহেতু শেষ যুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে এবং ধন-সম্পদে ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৩২ ঈসাব্দে প্রদত্ত খুতবায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের প্রতি এক মহান অনুগ্রহ দান করেছেন যে, জান্নাত এখন আমাদের হাতের নাগালে আর আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সেই পথ যা অবলম্বনে আমরা তথায় পৌঁছাতে পারি"।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জামাতকে সম্বোধন করে আল-ওসিয়্যত প্রসঙ্গে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করেছেন। আর সেই সব খুতবায় নামায ও ইবাদতে এবং আর্থিক কুরবাণীতে জামাতের সদস্যদেরকে আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুনগত ও সমষ্টিগত উন্নতি অর্জন করায় তাগিদ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) বলেন-"হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মঙ্গল সাধনে আর সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে শুভ পরিণাম লাভের সর্বাধীক কার্যকরী ও সুক্ষ্ম যে পথ দেখিয়েছেন তা হলো "নেযামে-ওসিয়্যত"। অতএব আমাদের নিবেদিত প্রাণে এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে এর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সংবদ্ধ থাকা উচিত যাতে আমরা আমাদের শেষ সময়ে আল্লাহ তাআলার সেই বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করি-**"ফাদ খুলি ফী ইবাদী, ওয়াদ খুলি জান্নাতি"** অর্থাৎ "অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (৮৯:৩০,৩১)। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন,

"খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের মাঠ বিরান পরে আছে। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হোন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তোমাদের জন্য সুসংবাদ- পূর্ণ উদ্যমে নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়ে এই দ্বারে যারা প্রবেশ করতে চাও, খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্য এটাই তাদের সুযোগ।" ('আল-ওসিয়্যত' পুস্তক)।

আল ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাই ঐশী খেলাফতকে ধারণ করে আর এই খেলাফতের মাধ্যমে মানব জাতির একতা বজায় থাকে আর তা সুদৃঢ় হয় আর প্রকারান্তরে আমাদের নিজেদেরকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে আল্লাহ্‌ তাআলার একত্বের বিকাশ ঘটায় আর জগৎসমক্ষে তৌহিদী সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে তা সাব্যস্ত করে। খিলাফত হলো সেই চুম্বক যা আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া ও করুণাকে আকর্ষণ করে। খেলাফতই হলো আল্লাহ্‌র রজ্জু, খেলাফতই হলো আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের ঐশী পথ, খেলাফতই হলো ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, খেলাফতই হলো আত্মরক্ষার ঐশী ব্যবস্থাপনা, খেলাফত হলো শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়, খেলাফত হলো মহান পুরষ্কার-**"আজরান আযীম"** (৪৮:৩০) আর এরই জন্য খেলাফতই হলো জান্নাত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এর সেই দোয়ার ফল ভোগকারী হলাম আমরা। আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ আমাদেরকে আল-ওসিয়্যতের সেই পথে পরিচালিত করেছে, অতএব আমাদেরকে সেই উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান নিতে অনুপ্রানিত হতে হবে আর সেই সাধনায় ব্রতী হতে হবে যাতে বলা হয়েছে–"ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন"– নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বাঁচা ও মরা সব বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (৬:১৬৩)।

অতএব, আসুন নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রদত্ত ঐশী নেয়ামত খেলাফতের এই রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা আহমদীয়া খেলাফতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই:)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর সমীপে সমর্পণ করে ইহজীবনেই জান্নাতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হই। আল্লাহ্‌ আমাদের এই একাগ্র বাসনাকে পূর্ণতা দান করুন, আমীন।

ইলেকট্রনিক-মিডিয়া ব্যবহার সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর উপদেশ ও নির্দেশাবলী

ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

১। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সমূহের (ইন্টারনেট, সেল-ফোন, টেক্সট্-বার্তা প্রেরণ, চ্যাটরুম এবং টিভি চ্যানেল সমূহ, টুইটার, ফেসবুক, ইত্যাদির মত যাবতীয় সামাজিক-নেটওয়ার্ক) অপব্যবহার থেকে আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্যের নিজকে রক্ষা করা একান্ত জরুরী।

২। ফেসবুকের উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক । এর ব্যবহার অনেক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার দিকে চালিত করে এবং ব্যবহারকারীদের জন্যে অনেক দু:খের কারণ ঘটায়। বিশেষ করে মেয়েদের উচিত, এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা। ফেসবুকের এমন অনেক ব্যবহারকারী রয়েছে, যারা ফেস বুকের এসব পৃষ্ঠা দেখে এর বিজ্ঞাপনগুলো পাঠ করছে এবং সেগুলোর উপর মন্তব্য করছে। এটা সর্বোতভাবেই এক অন্যায় কাজ এবং এসব অনধিকারমূলক পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে আমাদের নিজকে রক্ষা করা উচিত এবং এসবের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

৩। তবলীগের উদ্দেশ্যে ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে– www.alislam.org একটি দাপ্তরিক ফেসবুক- হিসাব খোলা হয়েছে এবং তবলীগকারীদেরকে প্রয়োজন বোধে এই পৃষ্ঠাটি পরিদর্শন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। তবলীগ করতে আগ্রহীদেরকে কোন কারণেই তাদের নিজেদের ছবি ফেসবুকে দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।

৪। ফেসবুকে ছবি প্রেরণের যে নিয়ম, তাতে যুবক ও যুব-মহিলাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি যদি এমন কোন যুবকের বিষয়ে জানো যে, ফেসবুকে তার হিসেব রয়েছে এবং সে এতে তার নিজ ছবি ফেসবুকে প্রেরণ করেছে, তবে অনুগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি সদর, খোদ্দামুল আহমদীয়াকে অবহিত করো এবং একই সাথে আমীর সাহেবকেও জানাও। একইভাবে লাজনা অথবা নাসেরাতের কোন সদস্যা যদি তাদের ছবি ফেসবুকে পাঠিয়েছে বলে জানা যায়, তবে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবেই সেটা অপসারণের অনুরোধ করা জরুরী।

৫। পিতা-মাতাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সন্তানদের টিভি ও ইন্টারনেট-ব্যবহার অত্যধিক সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা। সন্তানদেরকে টিভির অশ্লীল-প্রোগ্রামগুলো দেখতে দেয়া উচিত নয় এবং তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপরও সতর্ক-দৃষ্টি রাখা উচিত। এসব প্রোগ্রাম দেখা চোখের ব্যভিচারের সমতুল্য। সর্বক্ষণ হাতে সেল-ফোন রাখাও তাদের জন্যে উপযোগী নয়। মা দেরও জানা উচিত, কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়, যাতে তারা তাদের সন্তানদেরকে সাবধানতার সাথে দেখাশোনা করতে পারে।

৬। কতিপয় পিতা-মাতা আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যা ও ইন্টারনেট ব্যবহারে সুশিক্ষিত নয়। এজন্যে জামাত এবং এর অংগসংগঠনের (আনসার, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহমদীয়া) এটা কর্তব্য যে, এসব যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক করার প্রোগ্রাম চালু করা, যাতে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৭। শিক্ষা গ্রহণের খাতিরে ছেলে ও মেয়েরা কোন সহ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হলে সেটা গ্রহণযোগ্য। তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত নয়। এবং অপ্রয়োজনীয় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নয়, তা সেটা সাক্ষাতেই হোক অথবা টেক্সট্-মেসেজিং, ফেসবুক অথবা টেলিফোনের মাধ্যমেই হোক।

আল্লাহ্ তাআলা এ জামাতের প্রত্যেক সদস্যকেই সবধরণের ঝামেলা থেকে হেফাজত করুন এবং স্বর্গীয়-সংরক্ষণে রাখুন, আমীন।

নতুন বই পরিচিতি

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আরবী ভাষায় রচিত **'হামামাতুল বুশরা'** বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

এ বইটিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) একাধারে **দাজ্জাল, ইয়া'জুজ-মা'জুজ, দাব্বাতুল আরয-এর আবির্ভাব, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ, নুযুলে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা, তাঁর মুহাদ্দাস হওয়া, ফিরিশ্‌তাদের প্রকৃত পরিচয়** ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বইটি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার।

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

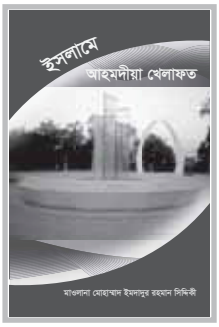

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (প্রিন্সিপাল, জামোয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ) সাহেব রচিত **'ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত'** বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

এ বইটিতে **খেলাতের নেযাম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।**

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

আমহদীয়া লাইব্রেরী-তে পাওয়া যাচ্ছে।
আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

কেন আহমদী হলাম

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

(দ্বিতীয় কিস্তি)

পবিত্র কুরআন মুসলমান জাতির পথ প্রদর্শক। মুসলমানগণ পথ-হারা হয়ে যাওয়ার কারণে এই কুরআন দ্বারাই তারা মুসলমানগণকে ঘায়েল করতো। যেমন, পাদ্রীগণ বলতো যে, তোমাদেরই ধর্মগ্রন্থ কুরআন থেকে তোমরাই বল এবং বিশ্বাস কর যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মরে গিয়েছেন, কিন্তু ঈসা (আ.) মরেন নাই, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন, আবারও তিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবেন তোমাদেরকেই উদ্ধার করতে; সুতরাং তাঁকে মেনে নিতে আপত্তি কিসের? এইরূপ যুক্তি-তর্কের মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে–যার মধ্যে বহু আলেমও রয়েছে। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদেরই বিজয় হবে, তোমাদেরই প্রাধান্য হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও"। প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুগে মু'মিনই বা কারা, প্রাধান্যই বা কাদের? একদিকে খ্রীষ্টান-রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, অপরদিকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহসে-শক্তিতে, সৌর্যে-বীর্যে বিশ্বের বুকে খ্রীষ্টান জাতিরই আজ প্রাধান্য। প্রশ্ন দাঁড়ায়, মু'মিন খ্রীষ্টান নাকি মুসলমান? এমতাবস্থায় আমি খ্রীষ্টান-মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। আমার মধ্যে যে সুমতি ও কুমতি আছে, তাদের মধ্যে শুরু হলো লড়াই। আমি কার উপর বিশ্বাস রাখি, জীবন্ত খোদার জীবন্ত পুত্র-যীশুর প্রতি অথবা মৃত আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদের প্রতি? বড় নবী কে? খ্রীষ্টানদের নবী যীশু নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা.)? খোদা তাআলার প্রতি বেশী প্রেম ও ভালোবাসা রাখেন, ঈসা (আ.) না হযরত মুহাম্মদ (সা.)?

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি বড় নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন, আর খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) কিনা অদ্যবাধি চতুর্থ আসমানে স্বশরীরে অবস্থান করছেন এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরই উম্মতগণকে উদ্ধার করবেন। আর তারই অপেক্ষায় আসমানের দিকে চেয়ে আছে কি-না মুসলমান জাতি! আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা যদি এরূপই হয়ে থাকে, তবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনও বড় নবী নহেন, নাউযুবিল্লাহ।

কেননা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চাইতে ঈসা (আ.)কে অজেয়-শক্তি প্রদান করেছেন। মুসলমান আলেম-ওলামাদের কথা যদি সত্যি হয়, তবে খ্রীষ্টানদের কথাই বা সত্যি হবে না কেন? হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন খ্রীষ্টান জাতির নবী। দ্বিতীয় বার যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান পক্ষ? তিনি স্বয়ং যে-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মের অনুসারী খ্রীষ্টান-পক্ষ ব্যতীত অন্য কোন পক্ষ অবলম্বন করতে পারবেন না। হয়তো বা সমগ্র পৃথিবীটাকেই তিনি খ্রীষ্টান বানিয়ে ফেলবেন। বর্তমান যুগে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার কার্য দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয়। এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, যখন তারা বলে যে, যীশু দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন, প্রেম দ্বারা জগতকে জয় করবেন এবং শান্তি ও সুখের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ইসলামের আলেম-ওলামাগণ বলেন, ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে বধ করার কাজে লেগে যাবেন। আলেম ওলামাগণের এই কথাটা বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে বড়ই খট্‌কার বিষয়। একজন মহাপুরুষ এসে অমনি তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে হত্যার কাজে লেগে যাবেন, আর বর্তমান এ্যাটোম-বোমা, ন্যাপাম বোমা, ইত্যাদির যুগে কাফেররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিবে, একথা কখনও যুক্তিসঙ্গত, সত্য-বলে বিশ্বাস হবে না। তারপর দাজ্জাল ও ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে তারা যে সকল কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করেন, এগুলি আমার কাছে আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য- দানবের ন্যায় কল্প-কাহিনী বলেই ধারণা হতো। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, খ্রীষ্টানগণ যা বলেন, অর্থাৎ-যীশু (ঈসা আ.) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন প্রেম দ্বারা সমগ্র জগতকে জয় করবেন এবং শান্তির স্বর্গরাজ্য কায়েম করবেন, একথাই সত্যি। অতএব যীশু (ঈসা আ.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তারপর মুসলমান জাতির দিকে একটু ভালো নজরে তাকালে মনে হতো না যে, এরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী এবং শ্রেষ্ঠ-নবীর উম্মত। কেননা বাস্তবে কাজে-কর্মে শ্রেষ্ঠত্বের কোন নজির তাদের মধ্যে পাওয়া যেত না। শিক্ষা-সভ্যতায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের কোন আদর্শ তাদের মধ্যে নেই। সকল দিক দিয়ে, সকল জাতির কাছে তারা অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত।

খ্রীষ্টানগণ বিশ্বের বিভিন্ন শহর বন্দরে, ঘাটে-গঞ্জে, এমন কি পল্লীর নিভৃত-কোণে তাদের ধর্ম প্রচার মিশন প্রতিষ্ঠা করত: তাদের ধর্মকে জীবন্ত রখেছে। মানুষের সেবায় স্কুল, হাসপাতাল, ইত্যাদি কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমানগণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, মরে গিয়ে কবে নাগাদ বেহশ্‌তে যাবে। আহমদী ভাই বোনেরা ক্যাপ্টেন ডগলাসের ন্যায়পরায়ণতার কথা অবশ্যই জানেন। তাদের এই গুণ অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। রাজনৈতিকভাবে যদিও তারা যুলুম

অত্যাচার করেছে, তথাপি তাদের হৃদয়ে ন্যায়ের-আসন যেমন পূর্বেও ছিল, এখনও আছে।

মুসলমান জাতির ভ্রাতৃত্বের কথা পুঁথি-পুস্তকে শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে দেখি তার উল্টা। শিয়া-সুন্নি, ওয়াহাবী, নক্‌শেবন্দীয়া, চিশতীয়া, দেওবন্দি, বেরেলবী, ইত্যাদি বহুধা-বিভক্ত হয়ে একদল আর এক দলের উপর কুফরীর তীক্ষ্ণ-তলোয়ার হস্তে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, ইত্যাদি কাঁট-ছাঁটের কাজে ব্যস্ত। এই সমস্ত লক্ষ্য করে আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতো যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে হত্যা করার কাজে লেগে যাবেন, তখন তিনি কাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন, সুন্নীদের পক্ষ, শিয়াদের পক্ষ, কিংবা অন্য কোন দলের? সে যাই হউক। যদিও আমি খ্রীষ্টান মতে বিশ্বাসী, তথাপি তাদের একটি কথাকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারিনি। আমার অন্তরের অন্ত:স্থলে যেন সেই কথাটি হাতুড়ি পিটাতো আর তা হলো যীশু ঈশ্বরের একমাত্র জাত-পুত্র। খোদা একজন নহেন। খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, খোদার পুত্র যীশু (ঈসা আ.) এক খোদা, তিনে এক, একে তিন, তিন জনে একজন, একজনে তিনজন, অর্থাৎ খোদা একজন নহেন, তিনজন। তখন থেকে শুরু হলো ধর্মের প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধাভাব। কোন কোন রাত্রে আমার ঘুম হতো না। এক একবার ভাবি, খোদা বলে কি কেউ আছেন, যদি থাক্‌বেনই তবে ধর্মের মধ্যে কোন মীমাংসা নাই কেন? আবার ভাবি, খোদা বলে যদি কেউ না-ই বা থাকেন, তা হ'লে আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা, ইত্যাদি সৃষ্টি করলোই বা কে? এখন আমি আস্তিকও নই, নাস্তিকও নই।

বহু চিন্তা-ভাবনার পর জানার এবং বুঝার আগ্রহ নিয়ে বড় বড় নামজাদা আলেম ওলামার স্মরণাপন্ন হতে লাগলাম। যেখানেই কোন নামজাদা আলেমের নাম শুনি, সেখানেই দৌড়াই হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে জানার জন্য। কলকাতার বড় মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে কিশোরগঞ্জের শহিদী মসজিদের মওলানা আতাউর রহমানের কাছেও গেলাম। সকলেই এক-বাক্যে বললেন যে, হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমানে স্বশরীরে জীবিত আছে। শেষ যুগে আবার তিনি চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে তরবারীর যুদ্ধে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। এসব প্রশ্ন করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। কলকাতার বড় মসজিদের ইমাম তো আমাকে মেরেই বসতেন, যদি না আমার পরিধানে নৌবাহিনীর পোষাক থাকতো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তোমাদের কর্তব্য হল শুনলাম এবং মানলাম, এতসব প্রশ্ন কেন? এখন আমি বললাম, আমিতো শুনলাম, মানবো কাকে? জীবন্ত-খোদার জীবন্ত-যীশু (ঈসা আ.)কে, অথবা মৃত আব্দুল্লাহ্‌র মৃত-পুত্র মুহাম্মদ (সা.) কে? মনে মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাব চলে এলো আলেমদের প্রতি আমার। স্থির করলাম, আর তাদের স্মরণাপন্ন হবো না। আমি এই ধারণা পোষণ করতাম যে, যদি হযরত (ঈসা আ.) চতুর্থ আকাশে স্বশরীরে জীবিত থেকে থাকেন, তবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ বা শেষ নবী নহেন।

হযরত ঈসা (আ.)ই বড় নবী, কেননা, তিনি জীবিত আছেন। এমতাবস্থায় তাঁর তুল্য আর কেহই নহেন। আলেম ওলামার স্মরণাপন্ন হওয়া থেকে হাত ধুয়ে সর্বশক্তিমান খোদা তাআলার স্মরণাপন্ন হলাম। নির্মল অন্তরীক্ষের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই বুকের ভেতর থেকে বের হয়ে আসলো, 'হে দুনিয়ার মালিক খোদা! সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছ কি? হে সমগ্র-জগতের পালনকর্তা খোদা তুমি আছ কি? যদি সর্বশক্তিমান খোদা বলে কেউ থেকে থাক, তবে আমি আজ বিপাকে পড়ে ডাকছি, আমার ডাকে সারা দাও। আমি পথ পাচ্ছি না, তুমি পথ দেখিয়ে কোলে তুলে নাও। বিপদে পড়েছি, উদ্ধার কর। আমি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরছি, কূল কিনারা পাচ্ছি না। আমি অন্ধ, বধির। পথ পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না কোনটি তোমার সত্য ও সঠিক পথ। আমাকে পথ দেখাও। আর, আজ যদি আমার ডাকে সাড়া না দাও, আর আমি যদি ভুল পথে চলে যাই, তবে তোমার সেই বিচারের দিন তুমি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করো না। এই কথা কয়টির সাথে সাথে আমার নয়ন যুগল থেকে কয় ফোঁটা গরম জলও ঝরেছিল। আল্লাহ্ যেন আমার ডাক শুনলেন। শুধু শুনলেনই না। আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কোন্‌টি তাঁর সত্য এবং সঠিক পথ।

ময়মনসিংহ, বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাকুন্দিয়া থানায় আহুতির গ্রামে আমার পৈত্রিক নিবাস। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ-শেষে চাকুরী করবো কি করবো না, ইত্যাদি ভাবনা নিয়ে কয়েক দিনের জন্য বাড়ীতে এসেছিলাম। দিন দুই পরে ঢাকার পথে। কলকাতা হয়ে বোম্বে যাব। যাবার পথে ঢাকা আমার কোন এক আত্মীয়ের বাসায় দু-এক দিন থেকে যাব মনস্থির করেছি। ইতোমধ্যে একদিন বেতাল নিবাসী আব্দুস সামাদ নামে আমার এক প্রাইভেট-শিক্ষকের সাথে দেখা! কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন ঢাকায় যাচ্ছ, তখন মির্জা আলীর কাছে আমার একটি চিঠি নিয়ে যাও, তাকে আমার এই চিঠি দিবে। এই বলে ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। শুনেছি মির্জা আলী সাহেবও নাকি তাঁর ছাত্র। নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলাম মঠখোলা থেকে, গয়নার নৌকা যোগে কাঁওরাইদ হয়ে ঢাকায়। গয়নার নৌকার ভিতর নানান জায়গার নানান লোক, তন্মধ্যে কয়েকজন আলেম, কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র, বাকী সবাই গরুর ব্যাপারী। তারা যাচ্ছেন মীরপুর, গরু কিনার জন্য। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় গয়নার নৌকাখানি সরগম হয়ে উঠলো বেশ। প্রথমে আলাপ পরিচয় তারপর গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে উঠলো কাদিয়ানীদের কথা। কেউ বললেন, কাদিয়ানী একটি নতুন ধর্ম, তারা হযরত রাসূল করীম (সা.)কে 'শেষ নবী'- বলে মানে না। কেউ বললেন কাদিয়ানী-ধর্ম খ্রীষ্টানদের একটি শাখা, বিভিন্ন লোভ লালসার মাধ্যমে লোকদেরকে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে। কেউ বললেন, কাদিয়ানীগণ দাজ্জালেরই চেলা, মানুষের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। বাপ-দাদা-চৌদ্দ পুরুষ যাবত আমরা যা মেনে আসছি, তারা বলছে ঠিক উল্টো।

'কাদিয়ানী'-নামটা যে প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নাম নহে, 'কাদিয়ানী' কথাটা যে তাদের সঠিক নাম নয়, এটা যে একটি স্থানের নাম এবং এটা যে নতুন কোন ধর্মও নয় বা খ্রীষ্টানদেরও শাখা নয়, বরং এটা মৃত প্রায় ইসলামকে সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিয়ে পুন:জীবন্ত করে তুলছে, তা তখন আমি জানতাম না। আমি তাদের মুখে শুনে মনে করলাম যে, হয়তোবা খ্রীষ্টানদের বহুবিধ শাখার মধ্যে ইহা একটি।

(চলবে)

মসজিদ শান্তি ও কল্যাণের স্থান

মাহমুদ আহমদ সুমন

মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান হল মসজিদ। মসজিদ শান্তির নীড়। মসজিদ সবার জন্য কল্যাণকর। আমাদের পাড়ায় বা মহল্লায় যে মসজিদটি আছে তা আমাদের সবার জন্য যদি কল্যাণকর এবং উপকারিই না হয় তাহলে মসজিদ নির্মাণের যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণতা পায় না। মসজিদ নির্মাণ শুধু নামায আদায়ের জন্য নয় বরং মসজিদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে সকলের কল্যাণের জন্য।

হযরত মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল অতি সাধারণ খেজুর পাতার কিন্তু তাতে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা আর শান্তির কোন কমতি ছিল না। বৃষ্টি পড়লে মসজিদে পানি ঢুকে কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়া সত্বেও মুসল্লিদের দ্বারা মসজিদ সব সময় থাকত ভরপুর। সামান্য খেঁজুর পাতায় নির্মিত মসজিদের সোভা ও সৌন্দর্যে যেন ঝক-মক করত। এর কি কারণ ছিল? এর কারণ একটাই, আর তাহল আমাদের প্রিয় নবী ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং তাকওয়ায় সুশোভিত তাঁর সাহাবিগণ। সেই খেঁজুর পাতার মসজিদের রূপের সাথে কোন মসজিদের কি তুলনা হতে পারে? মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল সমাজের সকল শ্রেণীর শান্তির কেন্দ্র। তাঁর মসজিদে আসতে ছিল না কারো বাধা, হোক না সে বিধর্মী বা যে কোন মতাদর্শের অনুসারি। তিনি (সা.) সবার সমস্যার কথা মসজিদেই আলোচনা করতেন এবং তার সমাধানও দিতেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের প্রতিনিধিদেরকে হযরত রাসূল করীম (সা.) মসজিদেই স্বাগত জানাতেন এবং তাদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। তাই নি:সন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর মসজিদ ছিল শান্তির কেন্দ্র আর তাঁর মসজিদ থাকত সব সময় ভরপুর।

একটি উচু বিল্ডিং-এর ছাদে দাড়ালে দেখা যায় রাজধানীতে হাজার হাজার মসজিদের সুউচ্চ মিনার। আর এসব মসজিদগুলোর মিনার উচ্চতায় যেমন দেখতেও জাঁকজমকপূর্ণ। মসজিদগুলোতে অনেক মূল্যবান কার্পেট, সমস্ত মসজিদ মোজাইক করা, টাইলস বসানো এবং শিতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। কতইনা উন্নত সব ব্যবস্থাপনা। এসব মসজিদের বিলাসিতা দেখে হৃদয়ে কান্না আসে হায়! আমার নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, খাতামান নাবেঈন (সা.) খেঁজুর পাতার মসজিদের ভেজা মাটিতে ইবাদত করে বছরের পর বছর পার করেছেন। যাঁর জন্য জগৎ সৃষ্টি তিনি কত কষ্টই না সহ্য করেছেন আর তাঁরই উম্মত হয়ে আমাদের অবস্থান আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আজকের মসজিদগুলোর দিকে তাঁকালে মনে হয়, এ যেন কোন রাজ প্রাসাদ। কিন্তু প্রশ্ন হল মসজিদগুলোতে দৈনিক পাঁচবেলার নামাজে কতজন নামাজ আদায় করেন? নামাজের সময় যদিও কিছু মুসল্লিকে দেখা যায় কিন্তু সারাদিনই মসজিদগুলো বিড়ান হয়ে পাড়ে থাকে। আমরা কি পাড়ি না মসজিদগুলোকে সব সময়ের জন্য আবাদ রাখতে? মসজিদ সবার জন্য কল্যাণকর একটি স্থান রূপে প্রকাশ করতে। মানুষ মসজিদে এসে প্রশান্তি লাভ করবে। মসজিদটি এলাকার সবার জন্য আশ্রয়স্থল হবে। এসব কি সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব। আমাদের মনমানষিকতাকে উদার করতে হবে। আমাদের সবাইকে বান্দার অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অসহায়দের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হল লোকেরা মসজিদে এসে প্রশান্তি লাভ করবে। পথহারা মানুষ সঠিক পথের দিশা পাবে, বঞ্চিতদের অধিকার প্রদান করা হবে, গরীব-দু:খী থেকে নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের আশ্রয়স্থল এবং কল্যাণকর হবে মসজিদ। আমরা যদি প্রকৃতভাবেই সেই মহান রাসূল ও শ্রেষ্ঠ নবী এবং খাতামান নাবেঈন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারী হওয়ার দাবী করি তাহলে তা শুধু দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলো সবার জন্য কল্যাণকর স্থানেই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছে। আজ সমগ্র বিশ্বে হাজার হাজার মসজিদ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সেগুলো থেকে শান্তির বার্তা ছাড়াচ্ছে। আমাদের সবার উচিৎ, মসজিদগুলোতে বেশি বেশি এশে একে সব সময়ের জন্য আবাদ রাখা। যেভাবে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে কেহ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, জান্নাতে আল্লাহ্ তার জন্য আপ্যায়ন প্রস্তুত করেন যতবার সে মসজিদে যায় (বুখারী ও মুসলিম)। তাই আমাদেরকে অনেক বেশি মসজিদ মুখি হওয়া উচিৎ আর ছুটির দিনগুলোতে পুরো পরিবারসহ মসজিদে এসে কাটাতে পারি এছাড়া যখনই সময় পাই অন্য কোথাও না গিয়ে মসজিদে এসে সময় কাটালেই সবচেয়ে উত্তম হয়।

আমাদেরকে সেই মহান রাসূলের শিক্ষার উপর আমলও করতে হবে। আমরা যদি তাঁর শিক্ষা মোতাবেক না চলি আর মুখে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার দাবী করে গর্ববোধ করি তাহলে এটা হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যদি মানুষের উপকারের জন্য কোন ব্যবস্থা না করি তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার স্বার্থকতা কি রয়েছে? যেভাবে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে কেউ সৃষ্টিজীবের প্রতি সদয় হয় আল্লাহও তার প্রতি সদয় হোন। অতএব পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি দয়ালু হও, সে ভালো হোক বা মন্দ। আর মন্দ লোকের প্রতি সদয় হওয়ার অর্থ তাকে মন্দ হতে নিবৃত্ত করা।' কতই না চমৎকার শিক্ষা বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর। আমরা কতটুকু তাঁর শিক্ষাকে মেনে চলি তা ভেবে দেখা উচিৎ।

আমরা জানি, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর মসজিদ ছিল সব শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত। সবার প্রয়োজন মসজিদ থেকেই তিনি (সা.) মেটাতেন। আমরা সবাই যদি তাঁর শিক্ষার উপর আমল করতাম তাহলে পৃথিবীতে দারিদ্র ও অশান্তি বলতে কোন কিছু থাকতো না। না খেয়ে কেউ দিনাতিপাত করতো না। আর বিশ্বময় এতো অরাজকতাও দেখা দিত না। পৃথিবীর সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে আজ আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শকে ভুলে গেছি। আমরা যদি তাঁর আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করতাম তাহলে আমাদের সমাজ ও দেশ হত শান্তিময়। তাই আমাদেরকে রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ আবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর তা পূন: প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত মসীহকে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই আমরা তাঁর প্রকৃত উম্মত বলে পরিচয় দেয়ার অধিকার লাভ করব। আর মসজিদগুলোকে যদি শান্তির নীড়ে পরিণত করতে পারি তাহলে আমাদের মসজিদগুলোতে প্রাণ সঞ্চার হবে, মসজিদ ফিরে পাবে হারানো গৌরব আর মসজিদ হবে সবার জন্য কল্যাণকর। বিশ্বের মসজিদগুলো সবার জন্য কল্যাণকর হোক এই কামনাই করি।

masumon83@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৪তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

(৯) ১০ই ডিসেম্বর ১৯২০ : আজ প্রাতেঃ নামাযে মনটা খুব গললো। নিজের জন্যে, সিলসিলার জন্যে , পিতা মাতা, স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, যত লোক স্মরণ হলো সবার জন্যে কেঁদে কেঁদে দোয়া করলাম। আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন যে, আমার জীবন, মরন ইবাদত উৎসর্গ সমস্ত তাঁর উদ্দেশ্যে হয়। কয়েকদিন হলো দোয়াতে যতই মন যাচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ততই দেখছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

(১০) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২০ : গত ১২ তারিখে বিশেষ তার এসেছে আমাকে এখানে (লন্ডনে) থাকতে হবে। নাইয়ার সাহেব আফ্রিকা যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করুন যে, যেখানেই থাকি না কেন, যেন তাঁর কাজ করতে ষোল আনা আত্মসমর্পন করতে পারি।.....১২ইং তারিখ সন্ধ্যের সময় "ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। খুব শীত ও বরফ সত্ত্বেও লোক এসেছিলো। বক্তৃতা শুনে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মিঃ গর্ডন প্রশ্ন করলেন যে, ইসলাম যদি পূর্ণ ধর্ম হয় তবে প্রত্যেক শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ আসার দরকার কি? উত্তর : কুসংস্কার [যথা ঈসা (আ.)-এর সশরীরে স্বর্গে গমন] দূর করা ও জীবন্ত আদর্শ দেখানো। উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন। আশা করা যায় ইনি শীঘ্রই ইসলাম গ্রহণ করবেন।

(১১) ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২০ : .....আমি ৪নং ষ্টার ষ্ট্রীটে চৌধুরী ফতেহ্ মোহাম্মদ সাহেবের কামরায় থাকছি। চৌধুরী সাহেব অক্সফোর্ড গিয়েছেন। গত ১৯ তারিখে মিস হ্যরোনি "ইসলাম এবং খ্রিষ্ট ধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ ১৯২০ সালের অক্টোবর সংখ্যা "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স" থেকে পড়েছিলেন। মিস এডিসন নাম্নী এক স্কটল্যান্ড দেশীয় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলো। ২২ তারিখে কে,সি ব্যানার্জি (ইঞ্জিনিয়ার) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার বাড়ী ঢাকা জেলায়। ১০/১২ বৎসর হলো ইংল্যান্ডে আছেন। ইংরেজ বিয়ে করেছেন। যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আজ প্রাতেঃ আমার এদেশে আসার পর এই প্রথম আযান দিয়ে ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়া হলো। মি. ফিশার নামাযে যোগ দিলেন। নামাযের পর নাইয়ার সাহেব দরস দিলেন। মিঃ ফিশার তা শুনলেন...

(১২) ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২০ প্রাতেঃ জামাতে নামায ও সূরা আল আসর পড়ে দরস দিলাম।.....সাড়ে ১২টার সময় হাইড পার্কে দেখি খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ খুব বক্তৃতা দিচ্ছেন। মিস নর্টম 'আহমদ থেকে মসীহের পুনরাগমন' প্রবন্ধ পাঠ করলেন। নাইয়ার সাহেব বক্তৃতা দিলেন। তখন ১টার বেশি হয়েছিলো। আমার মাথা বেদনা ছিলো বলে আমি কিছু বললাম না। বক্তৃতার পর .....'ইসলাম' ইত্যাদি সম্বন্ধে সুন্দর কথোপকথন হলো। সাহেবগণ যে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন আমার জবাব শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। আলহামদুলিল্লাহ্। .....ব্যানার্জি আমাদের সঙ্গে নামায পড়লেন ও দুই শিলিং চান্দা দিলেন। (জার্মানীতে প্রথম বাঙালি মিশনারী পৃঃ ৪০-৪৪)।

তাঁর স্কুল কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীকৃত ছয় মাস ছুটি শেষ হলে তিনি ভারতীয় দুতাবাসের মাধ্যমে আরো দেড় বছরের ফার্লো বিদায় ছুটি পান। এই দুই বছর পর এক বছর বিনা বেতনের ছুটি মঞ্জুরী লাভ করেন। প্রথম দুই বছর ভারতীয় সরকার থেকে বেতন পাওয়ার প্রেক্ষিতে জামাত থেকে কোন বেতন গ্রহণ করেননি। বিনাবেতনের ছুটির সময় নিজের ভরনপোষণের জন্য মিশন থেকে বেতন গ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনে মিশনারী হিসেবে দুই বছর কাজ করেছেন।

হিটলারের দেশ বলে খ্যাত জার্মানী। পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশ। প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করে আছে। খৃষ্টান অধ্যুষিত এ দেশে ত্রিত্ববাদের ক্রোশ ভেঙ্গে একত্ববাদের শিক্ষাকে বাস্তবরূপ দানের উদ্দেশ্যে ঐশী নেতা যুগ খলীফা অনুপ্রাণিত হন। প্রথম মিশনারী হিসেবে মনোনীত করেন বাংলা মায়ের সোনার সন্তান মৌলভী মোবারক আলীকে। ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে জার্মানীর বার্লিন যাবার নির্দেশ দেন। তাই লন্ডন থেকে তিনি জার্মানীবাসীর নিকট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের শান্তির পরশ বিলিয়ে দিতে জার্মান চলে যান। আহমদীয়া জামাতের প্রথম মিশনারী হিসেবে জার্মানীর মাটিতে ইসলামের শান্তির জামাত প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন।

বলাবাহুল্য, প্রথম জার্মানে যিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় পত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন তিনি হলেন মিসেস কারোলিন (ঈধৎড়ষরহ) । তিনি এক পত্রে হুযূর (আ.)কে লিখেন, আমি আনন্দিত হবো যদি আপনি আমাকে কয়েকটি উপদেশের কথা লিখে পাঠান। পৃথিবীর এ অংশ থেকে আপনার কোন কাজে আসতে পারলে সৌভাগ্য মনে করতাম।.....প্রিয় মির্যা সাহেব! আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন। আমি আপনার এক নিবেদিত বন্ধু (বদর, মার্চ ১৪, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ)।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। এ মহাযুদ্ধে পৃথিবীর এক কোটি সৈন্য নিহত হয়েছিল। এই নিহতের সংখ্যা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন। জীবিত সৈন্যদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রায় সত্তর লক্ষ সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। এছাড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বেসামরিক লোক মারা যায়। পুরুষের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। বেসামরিক জনসাধারণের যে ক্ষতি হয়েছে এর পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ছয়শত কোটি পাউন্ড। পরাজিত জার্মানীকে তা পরিশোধের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এর একশত কোটি ১৯২১ সালের ১ মে'র মধ্যে এবং বাকী অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ধার্য করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেয়া কষ্টসাধ্য ছিল। তাই তারা প্রথম কিস্তি পরিশোধ করে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। জার্মানী যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও পরাজিত হওয়ার কারণে সারা দেশে ছিল অভাব অনটনের হাহাকার। দ্রব্যমূল্যের ছিল অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি। মুদ্রাস্ফতিতে দেশের অর্থনীতি ছিল পঙ্গু। বিভিন্ন ভাবে দেশটি আমেরিকার নিকট নির্যাতিত ও অবরোধ্য ছিল। জন্মের পর শিশুরা পর্যন্ত পরিমিত শিশু খাদ্য পায়নি।

এমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুরাবস্থার মাঝে আমাদের

বাঙালি যুবক মোবারক আলী মানব মনের প্রশান্তি সৃষ্টির পথের দিশা নিয়ে তাদের দৌড় গোড়ায় যান। নিজের পরিবার-পরিজন আরাম ও আয়েশ ছেড়ে কষ্ট স্বীকার করে পরের কষ্ট লাগবে অকাতরে বিলিয়ে দেন ইসলামের শান্তির পরশ। এ বিশ্বভু-মন্ডলের স্রষ্টা ও মালিক রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তাআলা। তাঁর প্রেরিত বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূল করীম (সা.)। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগে আবির্ভূত ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তাঁর অনুগমনে ইসলামের পুনর্জাগরণে মানব মনের প্রশান্তি তথা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি নিহিত। মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে মানবতার মুক্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এ পথের পথিক হওয়ার মাঝেই মানব স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির উদ্দেশ্য লাভের সার্থকতা।

তখন বঙ্গবীর মোবারক আলী জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে এক ইহুদীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। আর আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করেছেন। অল্পদিনের মধ্যে জার্মানী ভাষা শিক্ষা লাভ করে ছোট ছোট তবলীগি পুস্তক ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বিতরণ করেন। ফলে তাঁর প্রচারণায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট তিনি সুপরিচিত হন। ভারত থেকে আগত একজন সাধু মণি ঋষী গুণী মহৎ ও মহানুভব ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই তাঁকে ধর্মগুরু হিসেবে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। তখন তিনি কিভাবে প্রচারকার্য করেছেন এর বর্ণনায় তিনি বলেন–

'বার্লিন থাকাকালীন আমি বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবার ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্বন্ধে ইংরেজিতে বক্তৃতা প্রদান করি। ছোট ছোট পত্রিকা ও পুস্তক জার্মান ভাষায় লিখে বিতরণ করা হয়। তখন বার্লিন শহরে অআহমদী মুসলমান অনেক ছিল। তাঁরা কেউ ভারত হতে, কেউ ইজিপ্ট হতে, কেউ প্যালেষ্টাইন বা বৈরুত ইত্যাদি বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে সেখানে এসেছিলেন। অনেকে শিক্ষার জন্য এবং অনেকে ব্যবসার জন্য আসেন। ভারতের প্রফেসর আব্দুল জব্বার নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে (ইউপি এর বাসিন্দা) একদল মুসলমান আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা সংবাদপত্রে আমাদের বিরুদ্ধে লিখতেন এবং আমাকে এর জবাব দিতে হতো। লাহোরী পার্টির মৌলভী সদরুদ্দীন ঐ সময় বার্লিনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নতুন মুদ্রা জারী হওয়ার পূর্বেই একটা মসজিদ তৈরী করেন। অআহমদীদের মধ্যে যারা আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরন করে লাহোরী পার্টিকেও তারা নিস্কৃতি দেয় নাই'। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ জুলাই ১৯৬৫)।

সে সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মোবারক আলী সাহেবকে জার্মানীতে জমি ক্রয় করে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। ফলে তিনি বার্লিনের কায়জার ডাম নামক স্থানে একটি বড় রাস্তার ধারে এবং বড় বড় অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট দুই একর জমি ক্রয় করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরী করা হয়। তখন বার্লিনে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফিতি ছিল। জার্মান মার্ক এর মূল্য একেবারে কমে গিয়েছিল। এক লক্ষ মার্ক দিয়ে একটি ট্রাম ভাড়া হতো না। ফলে তখনকার এস্টিমেট অনুসারে মসজিদের নির্মাণ ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরা হয়। ৫ আগষ্ট ১৯২৩ তারিখ মহাসমারোহে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতে জার্মান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অন্য একজন মন্ত্রীসহ বার্লিন শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত চার শত জনের মধ্যে মাত্র চারজন আহমদী ছিলেন। এতে প্রতিয়মান হয় মোবারক আলী সাহেবের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা কত উচ্চ ছিল। তখন হুযূর সানী (রা.) জার্মান মসজিদ নির্মাণের ব্যয় নির্বাহে জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে চাঁদা প্রদানের জন্য তাহরীক করেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ সালে এক জুমুআর খুতবায় বলেন :

ধর্ম বিষয়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভেদ নেই। ধর্মের আদেশ যেমন পুরুষদের জন্য নাযেল হয়েছে তেমনি স্ত্রীলোকদের জন্যও নাযেল হয়েছে। যথা জুমুআর খুতবা। এটা কেবল পুরুষ লোকদের লক্ষ্য করে বলা হয় না। স্ত্রীলোকেরা পর্দার আড়ালে বা বোরখার আড়ালে থাকলে খুতবা তাদেরকে লক্ষ্য করেও বলা হয়ে থাকে। অদ্য আমি বিশেষ করে স্ত্রীলোকদেরকে লক্ষ্য করে কিছু বলছি। আমি বিশেষ বিবেচনা এবং চিন্তার পর এটাই মনস্থ করেছি যে, জার্মানী দেশে আমরা যে মসজিদ বানাতে উদ্যত হয়েছি, তা স্ত্রীলোকদের চাঁদা দ্বারাই প্রস্তুত করা হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের আপন কোন ভূসম্পত্তি নাই। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে. তাদের সকলের কাছেই কিছু না কিছু অলঙ্কার আছে। সংসারের আয়ের কর্তা পুরুষ হলেও তাদের অনেকের কাছে সংসার খরচের অতিরিক্ত ধন থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের কাছে অলঙ্কাররূপে কিছু না কিছু ধন নিশ্চয়ই থাকে। সেইজন্য অভাবে পড়লে পুরুষ স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কিছু অলঙ্কার কর্জ নিয়ে অভাব দূর করে থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে চাঁদা চাওয়াতে পুরুষেরা এটা যেন মনে না করে যে স্ত্রীলোক কোথা থেকে চাঁদা দিবে, তারা ঐ চাঁদা আমাদের কাছ থেকেই নিবে। আমার ইচ্ছা তা নয়। স্ত্রীলোকগণ আপন আপন অলঙ্কার হতে চাঁদা দিতে পারেন। অলঙ্কার অধিক থাকা বা অল্প থাকতে কিছু আসে যায় না। খোদা তাআলা অল্প বা অধিক দেখেন না। তিনি মনের 'এখলাস্' (নিষ্ঠা) দেখে থাকেন। আমি ইচ্ছা করি যে জার্মানীর মসজিদ মেয়েলোকদের চাঁদা থেকে প্রস্তুত হউক। ইউরোবাসীরা মনে করে তা অন্য কার্যে লাগান হবে। এই কার্যে কেবল স্ত্রীলোকদের থেকেই চাঁদা নেওয়া হবে। যেন চিরকালের জন্য মসজিদটা স্ত্রীলোকদের এই খেদমতের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ রয়ে যায়।

আমি দোয়া করছি যে, খোদা তাআলা যেন আহমদী মহিলাদেরকে এই কার্যে অংশগ্রহণের তৌফিক দেন। আমীন। (আহমদীয়া বুলেটিন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)।

বার্লিন মসজিদ

তখন জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নিকট বার্লিন মসজিদ ফান্ডে চাঁদা প্রদানের জন্য হুযূর সানী (রা.) একটি সার্কুলার জারি করেন। নিম্নে এটা প্রত্রস্থ করা হল :

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) এর বিশেষ ..... পত্র

আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী সকলেই জানেন যে আমাদের এক ভ্রাতা মৌলভী মোবারক আলী সরকারি উচ্চপদ পরিত্যাগ করে ইসলামের 'তবলীগ' এর উদ্দেশ্যে লন্ডন নগরে গিয়েছিলেন। তিনি এখন জার্মানী দেশের প্রসিদ্ধ রাজধানী বার্লিন নগরে আছেন। তাকে জার্মানীতে পাঠাবার কারণ এই যে, অনেক দিন যাবত আমার এই খেয়াল ছিল, এই যুদ্ধে যে জাতি পরাস্থ হবে তাদের অবস্থা এমনই খারাপ হবে যে, খোদা তাআলার সাহায্য ভিন্ন নিজেদের রক্ষার পথ তারা অন্য কিছুতেই পাবে না। তখন তাদেরকে খোদা তাআলার দিকে ডাকার জন্য উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হবে। ঘটনাও তাই হয়েছে। এটা ছাড়া এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়া দেশে যে সকল অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে তার কারণ অন্যান্য দেশের সাথে তার কারবার এবং সম্বন্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছে; একমাত্র জার্মানীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল ঘটনা দেখে আমি বুঝেছি যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ হতে এ সময়ে জার্মানী দেশবাসীগণই ইসলামের কথা শুনবার জন্য অধিক প্রস্তুত হবেন। এ ছাড়া জার্মানীকে 'তবীগের' মরকজ (কেন্দ্র) তৈরী হলে সেখান থেকে রাশিয়া দেশে 'তবলীগ' করার পথও খুলে যাবে। সেই রাশিয়া দেশে ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করে এবং চতুর্দিকের অবস্থা দেখে আমি মৌলভী মোবারক আলী সাহেবকে জার্মানীতে পাঠাই। তিনি সে দেশের অবস্থা সবিশেষ দেখে এবং খুব চিন্তা করে যে সংবাদ দিয়েছেন তাতে আমাদের আশা আরও বেড়েছে। সেদেশে ইসলাম শীঘ্রই প্রচার হবে এটা তাঁর এত দূর বিশ্বাস যে তিনি আমাকে বার বার লিখছেন যে যত শীঘ্র হয় সেদেশে এক মসজিদ তৈরী করা হউক। আর যেমন করেই হোক ছয় মাসের জন্য যেন আমি স্বয়ং তথায় যাই। তাঁর বিশ্বাস যে এরূপ করলে অতি শীঘ্রই ইউরোপে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হবে। কিন্তু আমি ইউরোপের ভাষা জানি না এবং এত দীর্ঘ কালের জন্য 'সিলসিলার মরকজ' হতে বাইরে থাকাও যুক্তি যুক্ত নয়। এছাড়া এরূপ না করার পক্ষে আমি 'এশারা'ও পেয়েছি। এই সকল কারণে তাঁর এই পরামর্শ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু তিনি যে সেদেশে একটা মসজিদ এবং সিলসিলার এক মরকজ প্রস্তুত করতে পরামর্শ দিয়েছেন, তা গ্রহণ করা আমি শ্রেয় মনে করেছি এবং তা না করলে সিলসিলার ক্ষতি হবে বিবেচনায় তাঁকে সত্বর সেখানে মসজিদের জন্য জমি খরিদ করতে আদেশ দিয়েছি। তদনুসারে তিনি ৫ হাজার টাকায় এক খন্ড জমি খরিদ করেছেন। ঐ জমি নগরের কেন্দ্র স্থানে। এর পরিমাণ ৩ বিঘা হবে। শহরের কেন্দ্রে এত বড় জমি অন্য সময় লক্ষ টাকাতেও পাওয়া যাবে না। জার্মানীর বর্তমান দুর্দ্দশার কারণই এটা এত অল্প মূল্যে পাওয়া গিয়েছে। (মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের নিজ পত্রে জানা যায় যুদ্ধের পূর্বে ঐ জমির মূল্য সারে চারি লক্ষ টাকা ছিল– অনুবাদক)।

(চলবে)

যার অন্তরে কণা-পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

প্রবাদ আছে 'অহংকার পতনের মূল' অহংকার সম্পর্কে প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের সতর্ক থাকা উচিত। যিনি প্রকৃত মু'মিন হবেন, তার মাঝে তো অহংকারের লেশ-মাত্র থাকা উচিত নয়। অহংকার সর্বদা মন্দের দিকে ধাবিত করে।

পবিত্র কুরআন আমাদের বলে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তাদের অন্তর অবিশ্বাসপ্রবণ এবং তারা অহংকারী" (সূরা নাহল : ২৩)। অহংকারীর মাঝে এই প্রবণতা থাকে যে, তারা সর্বাবস্থায় অবিশ্বাসের মাঝে হাবুডুবু খায়। অবিশ্বাসের মাত্রা বেশী হয়ে থাকে। কোন কিছুকে সহজে তারা মানতে চায় না। তাদের মাঝে অন্যকে অবজ্ঞা করার ও পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের মাঝে চলার লক্ষণ দেখা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা লুকমানের ১৯ নং আয়াতে বলেছেন, "আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং ঔদ্ধ্যত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না"। এবার হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূল পাক (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে এক কণা-পরিমাণ অহংকার আছে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' কেউ বলল, যদি কেউ সুন্দর পোষাকও জুতা পসন্দ করে? তিনি বললেন, "অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চক্ষে দেখা বুঝায়" (মুসলিম)।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "অহংকার এমনি একটি আপদ, যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে অহংকার শয়তান হতে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

পৃথিবীতে আগমনকারী প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)কে অমান্য করার কারণে বা আনুগত্য না করার কারণে ইবলিস সম্বন্ধে বলা হলো যে, "সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো। আর সে ছিল অবিশ্বাসীদের একজন"। (সূরা বাকারা : ৩৫)

অহংকারী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরও কঠিন কঠিন কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা আ'রাফের ১৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়, আমি অচিরেই তাদের (দৃষ্টি) আমার নির্দেশাবলী থেকে সরিয়ে দিব। আর তারা সব নির্দেশ দেখলেও সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না।"

কুরআন ও হাদীস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, অহংকার করা কত মারাত্মক গুনাহ! যে কারণে অহংকারকে সব রোগের মা বলা হয়। মা যেমনি বংশধারা অব্যাহত রাখেন, তেমনি অহংকার দ্বারা বহু মানুষ সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সবাই বলে লোকটি অহংকারী। এ সর্বনাশা পাপ কিন্তু সবার মাঝেই কমবেশী আছে। কেউই অহংকার মুক্ত নয়। অহংকার-আত্মগর্ব নানা কারণে হয় যেমন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী পন্ডিত, আলেম-মুফতি, জজ-মিনিষ্টার, সচিব, প্রমুখ। আমার চেয়ে বড় কেউ নয়। যে কারণে নিজের অধীনস্থের উপর সুবিচার করে না। তুচ্ছ জ্ঞান করে। অথচ এমন অহংকার করে শয়তান অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "(আল্লাহ্ বলবেন) 'কখনো নয়, তোমার কাছে অবশ্যই আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল। (কিন্তু) তুমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং তুমি ছিলে ফকিরদের একজন। (সূরা যুমার : ৬০), দয়াময় আল্লাহ্ পাপ লোককে অনুতাপ করার ও আত্মসংশোধন করার অনেক সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন সে ইচ্ছাপূর্বক বারংবার সত্যকে প্রত্যাখ্যা করে, যখন তার পাপকর্ম ও অমিতাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার হিসাব দেবার দিন সমুপস্থিত হয় তখন তার অনুতাপ ও আক্ষেপ আর কোন কাজে আসে না।

অনেকে আবার অহংকার করে ধন-সম্পদের অর্থ-বিত্তের। কাড়ি কাড়ি টাকা দ্বারা সম্পদের পাহাড় গড়ে দম্ভে-গর্বে ফেটে পড়ে। তখন আর দৃষ্টি নিম্নমুখী হয় না। লক্ষ্য থাকে আকাশচুম্বী। সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে, যা কিনা নমরূদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে একথাও বলা আছে যে, কারূন আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। সম্পদের অহংকারে আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্ তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তার সম্পদের ভান্ডারসমূহের চাবি বহন করতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হতো।

এমনিভাবে অনেকে আবার জনবল শৌর্য-বীর্য, প্রভাব প্রতিপত্তির কারণেও অহংকার করে থাকে। সমাজে আমার অনেক দাম। আমাকে দেখলে লোকেরা রাস্তা ছেড়ে দেয়, ইত্যাদি। যা বস্তুত কাফেরদের স্বভাব। আবার আমরা অনেক সময় রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্যের কারণে অহংকার করে থাকি। যা চরম বোকামী। অহংকার মানুষ কখন করে? মনে রাখতে হবে যে, যখনই মানুষ নিজের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করবে যে, আমি-ই ভালো, আমিই বড়। এই বড়ত্বভাব এলেই তখন মানুষ অহংকার করে বসে।

এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর বয়াতের সপ্তম শর্তে বলেন, "ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা বিনয় নিষ্ঠাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।"

শয়তান প্রথম দিন অহংকার প্রদর্শন করার পর থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, আমি মানুষকে আল্লাহ্‌র বান্দা (আনুগত) হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করব। বিভিন্ন উপায়ে আমি মানুষকে নিজের চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ফেলব এবং সে যদি কিছু পূর্ণকর্ম ও করে, তবুও তাকে অহংকারের মাঝে নিয়ে যাব, যেন সে আস্তে আস্তে অহংকার প্রদর্শন করে সেই পুণ্যের সওয়াব বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং শয়তান প্রথম দিনই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা

করেছিল যে, মানুষকে সে সৎ-পথ থেকে ভ্রষ্ট করবে এবং সে নিজেও তো অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। অতএব সে এই অস্ত্রই মানুষের উপর বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, শয়তানী প্ররোচনা মানুষকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন যে, "মানুষের নফ্‌সে আম্মারাহ্ (কু-প্রবৃত্তি)-র মধ্যে অনেক প্রকারের অপবিত্রতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ হল-অহংকারজনিত অপবিত্রতা। যদি অহংকার না থাকত, তবে কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) থাকত না।" (তাযকেরতুশ শাহাদাতাইন)"।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "ইজ্জত বা সম্মান আল্লাহ্‌র পোষাক, অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর, তিনি বলেছেন, 'যে কেউ আমার কাছ থেকে এ দুটোকে কেড়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" (মুসলিম কিতাবুল বির্‌র ওয়াস্‌সিলাহ্)॥

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমি সত্য সত্যিই বলছি, কিয়ামতের দিন শির্‌কের পরে অহংকারের মত অন্য কোন বিপদ থাকবে না। এতো এমন এক বিপদ, যা ইহকাল ও পরকালে মানুষকে অপদস্থ করবে। একত্ববাদে (তৌহীদে) বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপাদৃষ্টি থাকে কিন্তু অহংকারীদের প্রতি তা থাকে না। শয়তান তো নিজেকে তৌহীদ-পন্থি বলে দাবী করতো; কিন্তু তার মাঝে অহংকার ছিল। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় বান্দা ছিলেন। যখন শয়তান তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখল এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করল, তখন সে ধ্বংসের পথে চলে গেল। এবং তার গলায় অভিশাপের বেড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হল। অতএব প্রথম পাপ, যা এক ব্যক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল, তা ছিল অহংকার"। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড; ৫৯৮ পৃ:)।

সুতরাং প্রসিদ্ধ বাণী 'অহংকার পতনের মূল'-এর প্রতি লক্ষ্য করে আসুন, আমরা গর্ব-অহংকার-মুক্ত আমাদের ব্যক্তি জীবন গড়ি। পাশাপাশি, অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম হতে আত্মরক্ষা করি। তাহলেই আমাদের সমাজ থেকে উঁচু-নীচুর প্রভেদ দূর হয়ে যাবে। ঘুচে যাবে অমানিশার সব অন্ধকার। আমাদের সমাজে ও চারপাশে এমন অনেক প্রকৃতির অহংকারীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। যাদের আচরণে সমাজ ব্যবস্থা কলুষিত হচ্ছে। তাদের উচিত, নিজেদের মাঝে আমুল পরিবর্তন আনা এবং একটি সুন্দর জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। প্রত্যেক আহমদীর তিনি কর্মকর্তা হোন আর সাধারণ সদস্যই হোন, বিনয়ী, নম্র এবং সদাচরণ ও উন্নত-চরিত্রের পথ অবলম্বন করা। আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি লাভ করা। আল্লাহ্‌র বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করা উচিত। আর এভাবেই প্রত্যেকটি গৃহ থেকে অহংকার দূর হবে।

নবীনদের পাতা

নামাযের কতিপয় রুকন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম– এতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়টি স্বয়ং খোদা-তাআলা পবিত্র নবী (সা.) কে জানিয়েছিলেন। নবী (সা.) যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তেমনি ইসলামও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর এর প্রতিটি শিক্ষাও অতুলনীয়। খোদা তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য প্রেরণ করেছেন, আর ইবাদতের একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সালাত বা নামায। নামাযের মাধ্যমে মানুষ খোদার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করে। নামাযের জন্য রয়েছে কিছু নিয়ম কানুন, রয়েছে কিছু অবশ্যকরণীয় বিষয়। নামায আদায়ের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য-বিষয়, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আরকানে নামায :

সর্বপ্রথম বিষয় হল নামাযের স্তম্ভ, যার উপর নামায দাঁড়িয়ে থাকে। তা হল সাতটি। (১) তাক্‌বির ও তাহ্‌রীমা (২) কিয়াম বা দাঁড়ানো (৩) ক্বিরাত বা তেলাওয়াত (৪) রুকু (৫) দুই সিজদাহ্ (৬) শেষ বৈঠক এবং (৭) সালাম। এর প্রত্যেকটি আদায় করা জরুরী এবং ফরজ। যদি কেউ জেনে শুনে এগুলো না করে, তবে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। যদি কেউ ভুল করে এগুলো না করে, তবে শেষ বৈঠকের পূর্বে ভুলে যাওয়া রুকন আদায় করে, শেষ বৈঠকে যাবে এবং সিজদাহ সাহু করবে।

ওয়াজেবাতে নামায :

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে-নামাযে অবশ্যকরণীয়-বিষয়, কিন্তু রুকনের চেয়ে এর গুরুত্ব কিছুটা কম। আর তা হচ্ছে ১২টি। (১) সূরা ফাতেহা পড়া (২) ফরজ নামায হলে প্রথম দু'রাকাতে আর সুন্নত বা নফল নামায হলে প্রথম দু রাকাতে ফাতেহার পরে কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়া। (৩) আমীন বলা (৪) রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো (৫) প্রথম সিজদাহ্‌র পর বসা (৬) দু'রাকাত নামায আদায় করার পর বসা (৭) বৈঠকে তাশাহুদ পড়া (৮) সালাম ফিরানোর সময় মুখ ডানে-বামে নেয়া (৯) প্রত্যেকটি জরুরী অংশকে জেনে-বুঝে প্রশান্তির সাথে আদায় করা (১০) প্রত্যেকটি অংশকে পর্যায়ক্রমে বা বিন্যাসের সাথে আদায় করা (১১) বা জামাত ফজর, মাগরিব, এশার প্রথম দু'রাকাতে, জুমুআর নামাযে, দুই ঈদের নামাযে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা ও সাথে অন্য সূরা উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করবেন এবং যোহর ও আসর এর নামাযে তেলাওয়াত নীরবে। (১২) ইমাম সাহেব তাকবীর ও তাহরীমা উচ্চ স্বরে করবেন, এগুলি যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তবে নামায হবে না। কিন্তু কেউ যদি ভুলে যায়, তবে সিজদাহ সাহু করলেই হবে। ওয়াজেব এবং রুকনের মধ্যে পার্থক্য হল রুকুন ভুলে গেলে তা শেষে আদায় করে তারপর সিজদাহ সাহু করতে হয়, কিন্তু ওয়াজেবের বেলা শুধু সিজদাহ্ সাহু করলেই হয়।

সুনানে নামায :

এটি এমন কাজ যা করলে নেকী পাওয়া যায়। ভুলে গেলে সিজদাহ্-সাহু করার প্রয়োজন নেই। এগুলো হল ১৫টি।

(১) তাক্‌বীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কান পর্যন্ত উঠানো (২) হাত বাধা (৩) সানা পড়া (৪) সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লা পড়া (৫) রুকুতে যাবার সময় তাক্‌বীর বলা (৬) রুকুতে তিন বার বা তার চেয়ে বেশী তাসবীহ পড়া। (৭) রুকু হতে উঠার সময়

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা'-বলা (৮) দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা। (৯) সিজদায় যাবার সময় ও উঠার সময় তাক্বীর বলা (১০) সিজদাতে তিন বার বা তার চেয়ে বেশী তাসবীহ্ পড়া (১১) মধ্যবর্তী বৈঠকের পর ৩য় রাকাতের জন্য তাক্বীর বলা। (১২) তাশাহুদ পড়ার সময় শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা (১৩) শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা ও অন্যান্য দোয়া পড়া (১৪) ফরজের শেষ দুরাকাত বা এক রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া। (১৫) বাজামাত নামাযে ইমাম সাহেব তাক্বীর তাসমিয়া, তাসলিম উচ্চস্বরে পড়বেন।

এসব কিছু নবী (সা.) এর সুন্নত হতে যাচাইকৃত। কেউ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে পাপী হবে। এর উদাহরণ এমন যে, কোন ছাত্র পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী নম্বর নিয়ে পাশ করল এবং এজন্য পুরস্কার পেল। যে এগুলো ভুলে যাবে সেও পাশ করবে কিন্তু এত বেশী নম্বর নিয়ে নয়। আর বিশেষ কোন পুরস্কারও পাবে না।

মুসতাহাবে নামায :

এটি নামাযকে সুন্দর করে, সওয়াব মিলে কিন্তু না করলে কোন গুনাহ্ নেই। এটি হল (১) নামাযে দাঁড়ানোর সময় দৃষ্টি সিজদাহর স্থানে এবং রুকুর সময় পায়ের উপর, বৈঠকের সময় সিনার উপর দৃষ্টি সংযত রাখা আর এদিক ওদিক না দেখা। রুকুতে হাত হাটুর উপরে সোজা করে রাখা আর বাহু হতে আলাদা রাখা। রুকু হতে দাঁড়ানোর পর হাত সোজা ছেড়ে রাখা, সিজদাহ্‌তে যাবার সময় এমনভাবে যেতে হবে যেন প্রথমে হাটু, পরে হাত, এরপর নাক অবশেষে কপাল মাটিতে লাগাবে। সিজদা হতে উঠার সময় প্রথমে কপাল পরে নাক, অবশেষে হাটু উঠাতে হবে। হাত বা কোন জিনিসের সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানো ঠিক না। বৈঠকের সময় হাত রানের উপর আঙ্গুল কিবলামুখী। মহিলারা তাক্বীরে তাহরীমার সময় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাবে, কান পর্যন্ত উঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রথম রাকাতে একটু বড় সূরা আর ২য় রাকাতে তুলনামূলক ছোট সূরা পড়া উত্তম। বাজামাত নামাযে মাগরিব, এশা, ফজর নামাজে বিসমাল্লাহ্ আস্তে পড়া, আমীন জোরে পড়া ও তাহ্‌মীদ আস্তে পড়া। এগুলো ভুলে গেলে সিজদাহ সাহু প্রয়োজন নেই।

মাকরুহাতে নামায :

কিছু এমন কাজ রয়েছে যা নামাযে করা অপছন্দীয় বা করা ঠিক না। এমন অপছন্দনীয় কাজ হতে সর্বদা বাঁচা উচিত। সেগুলো হলো আকাশের দিকে তাকানো, চোখ বন্ধ রাখা, তাড়াতাড়ি নামায পড়া, কোন কারণ ছাড়াই দেয়াল বা কিছুর সাহায্য নেয়া, খালী মাথায় নামায পড়া, সিজদাহ্‌র সময় পা মাটিতে না লাগানো, অভুক্ত পেটে খাবার সামনে রেখে নামায শুরু করা, বাথরুমের চাপ থাকা সত্ত্বেও নামায পড়া, কবরস্থান সামনে রেখে নামায পড়া, একদিকে সালাম ফিরানো, নামায পড়ার সময় এমন পোষাক পড়া, যাতে রুকু, সিজদাহ ও বৈঠকে কষ্ট হয়।

এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, কারণ ছাড়া একটি কাপড় জড়িয়ে নামায পড়া, মসজিদে জুতা নিয়ে নামায পড়া, এমন স্থানে নামায পড়া যা পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় এবং নামাযে একাগ্রতা না আসা, খোলা জায়গায় নামায পড়ার সময় (যার পাশ দিয়ে রাস্তা আছে) সামনে উঁচু কোন জিনিস না রাখা, তাক্বীর তাহরীমার সময় হাত কান হতে উপরে উঠানো, সালামের উত্তরে মাথা নাড়ানো, খাবার পর কুলি ছাড়া নামায পড়া, কোন জিনিষ মুখে রেখে নামাজ পড়া, ১ম রাকাতে যা তেলাওয়াত করা হয়েছে কোন কারণ ছাড়া পরের রাকাতে এর পরের অংশের পরিবর্তে পূর্বের অংশ তেলাওয়াত করা, বাজামাত নামাযে ইমামের আগে রুকু ও সিজদাহ্ হতে মাথা উঠানো, উপরে বর্ণিত কোন একটি কাজ করলে নামাযে দাগ পড়ে, যাতে নামায পরিপূর্ণ হয় না, নেকীতে কমতি দেখা দেয়।

নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া ঠিক না, যে যাবে, সে পাপী হবে। নবী (সা.) এমন ব্যক্তিকে শয়তান বলেছেন। বেশী নিকট দিয়ে গেলে তাকে আটকানো উচিত। আটকানোর পরেও যদি যায় তবে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না, আর নামায ভাঙ্গবে না। যেতে হলে এক সারি বাদ দিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ নামায আদায়কারীর দাঁড়ানো ও সিজদার স্থানের ভিতর দিয়ে নয়। নামাযরত অবস্থায় কোন বিষাক্ত প্রাণী, সাপ, বিচ্ছু, কুকুর ইত্যাদি যদি আসে, তবে এটিকে মারা যাবে বা তাড়িয়ে দেয়া যাবে, এতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

মুবতেলাতে নামায :

এমন কাজ, যাতে নামায ভেঙ্গে যায়, তা নিচে দেয়া হল : নামাযের কোন শর্ত বা রুকুন বিনা কারণে জেনে শুনে ছেড়ে দেয়া, নামাযরত অবস্থায় নামায ছাড়া, কারো সাথে জেনে শুনে কথা বলা, সালামের উত্তর দেয়া, এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা, খিল খিল করে হাসা, নামাযের মধ্যে অন্য কোন কাজ করা, নামাযে ওযু ভাঙ্গা, ছতর খুলে যাওয়া, শরীর বা কাপড়ে ময়লা লাগা। এরূপ কোন কাজ হলে নামায ভেঙ্গে যায় আর পুনরায় নতুন করে নামায পড়তে হয়। অজান্তে ওযু ভেঙ্গে গেলে নিরবে এসে ওযু করে যেখানে নামায ছুটে ছিল সেখান হতে নামায আদায় করা যায়। উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি কাজ জরুরী, তা পালন না করলে নামায আদায় পরিপূর্ণ হবে না পুরোপুরি প্রতিফল পাওয়া যাবে না। আমরা যারা নিজেদের 'মুসলমান'-দাবী করি ও খোদার নৈকট্যের আশা রাখি, তাদেরকে এসব কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, আর একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করতে হবে, তবেই ইবাদত স্বার্থক হবে।

মোহাম্মদ রুহুল বারী
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
তথ্য সূত্র : ফিকাহ আহমদীয়া

শুভ বিবাহ

২০/০১/২০১২ তারিখে মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, পিতা-মির্জা আসাদউল্লাহ গালিব, গ-১৯/৪ সেকেনদার বাগ, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা এর সাথে সাঈদ উদ্দিন আহমদ, পিতা-খোদাদাদ আজিজ আহমদ, 76-13,91 AVE Woodhaven New York USA-এর বিবাহ ৮,৫০,০০০/- (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৬৩/১২

১০/০২/২০১২ তারিখ মোছাঃ নাসিরুর রহমান ইনাব, পিতা-জি, এম, নাজিবুর রহমান, কয়ানিজ পাড়া, জিন্নানগর, সৈয়দপুর নীলফামারী এর সাথে মোহাম্মদ ওয়াসিম সাত্তার সুজন পিতা-মৃত মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ১০৪৯, পশ্চিম নন্দিপাড়া এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিনলক্ষ এক) টাকা সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৭৯/১২

১৭/০২/২০১২ তারিখ মোছাঃ রোকশানা আক্তার নিশি, পিতা-এজাজ আহমদ, ৪৭/১ পশ্চিম নন্দিপাড়া, মাদারটেক এর সাথে মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, পিতা- ডাঃ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন থানাপাড়া, তারাগঞ্জ এর বিবাহ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮০/১২

মোছাঃ কাজল রেখা, পিতা-শরীফ আহমদ. ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মুন্সি, পিতা-মোহাম্মদ সোলায়মান মুন্সি, গন্ডামারা, চরদুখিয়া, চাঁদপুর এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮১/১২

সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে ধর্মীয়ভাবগাম্ভির্যের সাথে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা

গত ০৪/০৫/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব লস্কর এর সভাপতিত্বে কুমিল্লায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন কবির আহমদ। নযম পাঠ করেন আশরাফুল ইসলাম শান্ত। বক্তৃতা পর্বে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অতুলনীয় আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব তাহের আহমদ অতুল, কাজী মুখলেছুর রহমান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমদ এবং মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

বানিয়াজান

গত ২৯/০৪/২০১২ রবিবার বাদ মাগরিব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বানিয়াজান জামাতে সীরাতুন নবী জলসা আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় স্থানীয় আহমদী মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার জনাব শাহজাহান এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, নযম পরিবেশন করেন মৌ. আসাদুজ্জামান। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মুজাফফর আহমদ, জয়ীমে আলা আনসারুল্লাহ্ বানিয়াজান, মৌ. এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করা হয়। এতে ১৫ জন গয়ের আহমদীসহ ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল বারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম

গত ২০ এপ্রিল ২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্রগ্রামের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন, হাদীস ও নযম পাঠের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন বুশরা মজিদ, নুসরাত মোনেম এবং আয়শা ইশরাত। সবশেষে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর দোয়া সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন আমাতুন নাজীম। এতে ৮০ উপস্থিত ছিলেন।

সেক্রেটারী ইশায়াত, চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২৪/০৪/১২ রোজ মঙ্গলবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাছিমা বশির। হাদীস পাঠ করেন সাহিনা সাব্বিবর এবং নযম পাঠ করেন নুছরত জাহান। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্য জীবন, উত্তম চরিত্র এবং ইসলাম প্রচারে তাঁর আদর্শ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন নসরত জাহান, আফরোজা মতিন, সুফিয়া পারভীন, তাসলিমা বেগম, নাছিমা বশির এবং প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। এতে ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১১/০৪/২০১২ রোজ বুধবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন তামান্না হাছিন। নযম পরিবেশন করেন নাছিমা বশির। এতে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন আফরোজা মতিনস এবং কুরআতুল আইন। শেষে প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর বক্তব্য রাখেন। উক্ত সেমিনারে ৫৭ জন লাজনা ও ১১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার মুসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৪/২০১২ শনিবার খুলনায় প্রথম মুসী সম্মেলন পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজমা ইসলাম। অত:পর হাদীস পাঠ করেন রওশানারা রেখা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন নাজমা কাশেম। সম্মেলনে ওসীয়্যতের গুরুত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন কুরাইশা মাজেদ, রোজিনা শাহিন, তাহেরা মাজেদ রাফা এবং প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকশানা মঞ্জুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আশুলিয়ার 'ডিইপিজেড' নামে হালকা প্রতিষ্ঠা

গত ২০ এপ্রিল, ২০১২ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আশুলিয়ার 'ডিইপিজেড' নামে একটি হালকার কার্যক্রম শুরু হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে বেশ কয়েকজন আহমদীর সংখ্যা হওয়ায় এবং কালিয়াকৈর ও এর আশ-পাশ হতে জুমুআর নামায আদায়, জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে সকলের পক্ষে আশুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয় তাই 'ডিইপিজেড' এলাকায় হালকা প্রতিষ্ঠা করে জুমুআর নামায এবং জামাতের তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগের কার্যক্রম করতে আশুলিয়া জামাতের প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করা হয়। সে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট সাহেব 'ডিইপিজেড' কে হালকা করার সদয় অনুমতি প্রদান করে কেন্দ্রকে অবহিত করেন। গত ২০ এপ্রিল, ২০১২ শুক্রবার এ হালকায় জুমুআর নামায আদায়ের মাধ্যমে হালকার কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। জুমুআর নামায পড়ান জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এখন এ হালকায় নিয়মিত জুমার নামায, তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করা হচ্ছে। এ হালকার ছোট-বড় সকল সদস্যই আর্থিক কুরবানীতেও অংশ গ্রহণ করছেন। জামাতের সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ এ হালকার সকল সদস্যই যেন আদর্শ আহমদী হিসাবে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক লাভ করেন সেজন্য খাস দোয়ার আবেদন ।

মসিহউর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস

১৩-০৪-২০১২ তারিখ রোজ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আসিয়া জামান নোভা। হাদীস পাঠ করেন আসিয়া নাসির। দোয়া ও আহাদ পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন রেহানা জাফর, শামীমা ইয়াসমিন, শাহীনা মোস্তাক এবং সভানেত্রী। বাংলা নযম পাঠ করেন সোফিয়া খিলাত। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রোকশানা মঞ্জুর

চান্দপুর চা-বাগান

চান্দপুর চা-বাগান জামাতের উদ্যোগে গত ১৩/০৪/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জনাব আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইফতেখার আহমদ, নযম পাঠ করেন কামরুল হাসান ইমন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইফতেখার আহমদ, কামরুল হাসান ইমন, ইমরান চৌধুরী, ইকবাল চৌধুরী, মৌ. রফিকুল ইসলাম এবং পর্দার আড়াল থেকে লাজনাদের পক্ষ থেকে রানু বগম চৌধুরী, আমাতুন নূর মুন্নি ও আইরিন আক্তার ভূইয়া বক্তব্য রাখেন। সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

তেজগাঁও জামাতে তবলিগী সভা

গত ৫ মে ২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এ বাদ মাগরীব থেকে নিয়ে রাত ১০.৩০ মি. পর্যন্ত তবলিগী প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। দোয়া পরিচালনা করেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এরপর স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম বিশ্বাস ও পরিচয় তুলে ধরেন। আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তেজগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল ওয়াদুদ এবং জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তবলিগী আলোচনা সভায় মেহমান ৬২জন এবং আহমদী ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

কৃতী ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর হালকার মরহুম রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর বড় ছেলে জনাব সালাহ উদ্দিন চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে সাজিয়া নউরীন সাজ ২০১২ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় এস, সি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সুনামগঞ্জ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও সন্তান। সে ২০০৫ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের বোমা হামলায় আহত সদস্যা হুসেনা বেগম এর বড় পুত্রের প্রথম সন্তান। তার উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যত উন্নতির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়াপ্রার্থী।

জসিম উদ্দিন চৌধুরী

তেজগাঁও মসজিদের তৃতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন

গত ১৬ এপ্রিল ২০১২ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এর মসজিদের তৃতীয় তলার ছাদ ঢালাই কাজের উদ্বোধন হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব ডা. এম,এ রশীদ, তেজগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ফাইনান্স, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং জামাতের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম

রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ৮ম বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ রংপুর রিজিওনের ৮ম বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম সম্মেলন গত ২৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে সৈয়দপুর মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। নায়েব সদর আউয়াল মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর সফেদওম নঈম আলম খান, শহীদুল ইসলাম বাবুল কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ, জাহাঙ্গীর বাবুল, তাহরীকে জাদীদ, উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রে থেকে যোগদান করেন। এতদ্‌ঞ্চলের ১৮টি মজলিস থেকে ১৪ জন যয়ীম, একজন প্রতিনিধি, ১৫ জন স্থানীয় কর্মকর্তা বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের জেলা নাযেমদ্বয় যথাক্রমে জনাব আবুল কাসেম ও জনাব মাহমুদ আহমদ ও তাদের আমেলার ৫ সদস্য এবং খাকসার সম্মেলনে যোগদান করি। জনাব নায়েব সদর আউয়াল এর সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে দশটায় কর্মশালা ও সম্মেলনের ১ম অধিবেশ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। সভাপতির দোয়া ও আহাদ পরিচালনার পরে মূল্যবান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এর পরে বৃহত্তর রংপুরের ৮ জন যয়ীম তাদের মজলিসের রিপোর্ট এবং কাজের আগাম পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বেলা তিনটায় জনাব নায়েব সদর আউয়াল এর সভাপতিত্বে ২য় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে বৃহত্তর দিনাজপুরের ৬ জন যয়ীম ও ১ জন প্রতিনিধি তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরে জেলা নাযেমদ্বয় তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। খাকসার রিজিওনাল নাযেম হিসেবে রিপোর্ট পেশ করি। এরপর এরপর কেন্দ্র থেকে আগত প্রতিনিধিগণ মজলিস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ এবং করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর সভার সভাপতি ও নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে এই কর্মশালা ও সম্মেলনের সফল সমাপ্তি হয়।

খন্দকার মোহাম্মদ মাহবুব উল ইসলাম

ফতুল্লায় তালিম ক্লাস ও আতফাল দিবস পালন

গত ২৮-৩০ এপ্রিল ৩ দিন ব্যাপী ফতুল্লায় কেন্দ্রের সিলেবাস মোতাবেক তালিমী ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে প্রতিদিন ১২ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। এর পর ১লা মে ২০১২ দিনব্যাপী আতফাল দিবস পালন করা হয়। দিবসে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং খেলাধূলার প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বিকালে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নূহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 21st Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th May, 2012 | Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি
রেস্তোরাঁ

তৃতীয় শাখা এখন **গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে**

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com